ইসলামের দৃষ্টিতে

রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ

ডঃ আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান

বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট
অব ইসলামিক থ্যট

1989

ইসলামের দৃষ্টিতে

রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ

ডঃ আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে

রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ

ডঃ আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান

অনুবাদ ঃ আকরাম ফারুক

বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
১৪৫ গ্রীণ রোড়, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
(জি পি ও বক্স- ৪৫৪, ঢাকা-১০০০)
ফোন ঃ ৯১১৪৭১৬, ৩২৯৫৩২
ফ্যাক্স ঃ (৮৮০-২) ৯১১৪৭১৬
E-mail : biit@citechco.net

বাংলায় প্রকাশকাল ঃ ২০০১ ইং ১৪২২ হিঃ
© বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ISBN 984-8203-27-8

মুদ্রণেঃ অ্যামেটকো ২০০০
১৮৬/১, তেজকুনীপাড়া, ফার্মগেইট
ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
মোবাইল-০১৭৬৪৫৬১৯
ফোন-৯০০৭৩৭৩

মূল্য ঃ অফসেট ঃ ৬০ টাকা, সাদা ঃ ৪০ টাকা

This is a Bengali version of *Al-Unfwa-Idaratus Syrais-Siyasi Bainal Mabdaee wa-al-Khiar-Ruaitun Islamiyah* by Dr. AbdulHamid Ahmad AbuSulyaman, published by International Institute of Islamic Thought, USA. Translated into Bengali by Moulana Akram Farooq and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), Dhaka.
The orginal paper (now the book) was published in Islamiyat Al Marifah a refereed Arabic Quarterly pbulished by IIIT in its 15th issue in 1999.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

রাজনীতির ইতিহাস যতো পুরোনো, সংঘাতের ইতিহাস সম্ভবত তার চেয়েও পুরোনো। মানাবেতিহাসের আদি কাল থেকেই মানুষ কখনও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে, কখনও বা দল-উপদলের প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজনে পারস্পরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে কিন্তু রাজনীতির ধারণার বিকাশ লাভের পর থেকে সংঘাতের রূপ বদলে যায়। ক্ষমতালোভ, রাজ্য বিস্তার, আধিপত্য বিস্তার, বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন প্রভৃতি কারণে সহিংস সংঘাত ব্যাপকতর হয় ।

রাজনৈতিক সংঘাত এবং সহিংসতার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দু'টো দিকই রয়েছে। সহিংস সংঘাতের মাধ্যমে একদিকে যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়, অন্যদিকে তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিংসতার শিকার হয়ে বিধ্বস্ত হয় স্বাধীনতাকামী নিরীহ জনগোষ্ঠী । পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম যেমনি তাদের অপছন্দের কোন স্বাধীনতাকামী আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সহিংস সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে, তেমনি মুসলিম বিশ্বের কিছু প্রচার মাধ্যমও একই সুরে সুর মিলিয়ে নিজেদের বাজারদর টিকিয়ে রাখার জন্য আত্মঘাতি প্রচারে লিপ্ত হয় । আজকের ফিলিস্তিন, বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর প্রভৃতি সংঘাতময় ভূখণ্ডের প্রতি দৃকপাত করলে এর সত্যতা নিরূপণ সহজ হয়।

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট কতৃক প্রকাশিত জার্নাল *ইসলামীয়াত আল মারিফাহ* এর ১৯৯১ সালের উইন্টার সংখ্যায় (Winter Issue) এ বিষয়ে ডঃ আব্দুল হামীদ আবু সুলাইমানের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যা পরবর্তীতে আরও সম্প্রসারিত আকারে ইনস্টিটিউট কতৃর্ক বই আকারে প্রকাশিত হয় । এতে লেখক কোরান ও হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর কর্মকান্ডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যাখ্যায় কিছু মূলনীতি তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্যের শেষ কথা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ তার চিন্তা পদ্ধতির সংস্কার ও সংশোধন করার জন্য শান্তিপূর্ণ পরামর্শ ভিত্তিক ও শিক্ষামূলক কর্মপন্থা অবলম্বনের বাধ্যবাধকতা মেনে চলা ছাড়া গত্যান্তর নেই। খেলাফত, হেদায়াত ও পূনর্গঠনের যোগ্য মানুষ কেবল উক্ত পন্থায়ই পূনরায় তৈরী করা সম্ভব।

বইটি মুল আরবী ভাষা থেকে বাংলায় প্রকাশের জন্য লেখকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, এর ভাষান্তরকরণে মাওলানা আকরাম ফারুক সাহেবের নিরলস শ্রম আমাদের উদ্যোগ সফল করেছে। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘাত সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক এবং বুদ্ধিজীবি মহলকে কিছুটা হলেও সচেতন করতে পারলে আমাদের এ সামান্য প্রচেষ্ট সফল মনে করব।

আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

১৫ মার্চ, ২০০১

এম, জহুরুল ইসলাম
সেক্রেটারী জেনারেল
বি. আই. আই. টি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ৯

প্রথম অধ্যায়
ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সহিংসতা ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
কোরান, হাদীস ও সহিংসতার সাথে সংশ্লিষ্ট নবীযুগের ঘটনাবলীর তাৎপর্য উপলব্ধিতে ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গীর আবশ্যকতা ২৩

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক বিরোধ নিরসনে সহিংসতা বর্জন ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় বরং নীতিগত ব্যাপার। ৩৯

চতুর্থ অধ্যায়
সামজের প্রতি সদয় আচরণই সমাজের ন্যায়বিচার ও উদারতা প্রতিষ্ঠার উপায় ৪৩

পঞ্চম অধ্যায়
শান্তিপূর্ণ দাওয়াত ও প্রতিরোধ আন্দোলনসমূহের ইতিহাস থেকে কিছু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদে সহিংসতা ৫৩

সপ্তম অধ্যায়
শক্তি প্রয়োগ ও তাবেদার সরকার ৫৯

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়
যুলুম প্রতিরোধ ও ত্বরিত পরিবর্তনপ্রিয়তার প্রতিকারের পনথা হিসাবে হিজরত বা অভিবাসন ৬৫

নবম অধ্যায়
সভ্যতায় সভ্যতায় সংঘাত- ৭১

দশম অধ্যায়
ওহির বাণীকে ব্যাপকতর অর্থে অনুধাবন ও ইতিহাসকে ভালভাবে অধ্যয়ন করার মধ্যেই সমাধান নিহিত ৭৯

একাদশ অধ্যায়
সারসংক্ষেপ ৮৫

দ্বাদশ অধ্যায়
একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সমস্যা ৮৯

www.pathagar.com

ভূমিকা

মানব সমাজে সহিংসতা ও রক্তক্ষয়ী সংঘাত এমন কোন বিরল ঘটনা নয়, যা কারো কাজে অপ্রত্যাশিত মনে হতে পারে। বরঞ্চ ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মানবেতিহাসের সর্ববৃহৎ পরিবর্তনগুলো ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলো প্রায়শই রক্তক্ষয়ী সংঘাত-সংঘর্ষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর সাথে যদি ইসলামের ইতিহাসের সেই সব সংঘর্ষ, সহিংসতা ও যুদ্ধবিগ্রহকেও যুক্ত করা হয়, যা বহু সংখ্যক মুসলিম দল ও গোষ্ঠীর ভেতরে সংঘটিত হয়েছে, এবং যার পরিণতিতে বিশাল বিশাল মুসলিম রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে, তাহলে দেখা যায় যে, সেই রক্তাক্ত পরিস্থিতিই খলিফায়ে রাশেদ হযরত উসমান ইবনে আফফানের শাহাদাত থেকে শুরু করে পরবর্তী সংঘাত-সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনাবলীর জন্ম দিয়ে শেষ পর্যন্ত গোটা খেলাফতে রাশেদার পতন ঘটিয়ে ছেড়েছে এবং স্বৈরাচরীরা নির্যাতনমূলক ও গোষ্ঠী বিদ্বেষ ভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহের জন্ম দিয়েছে।

এজন্য আমি আমার গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানমূলক কার্যক্রম চালানোর সময়ে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন বোধ করিনি যে, মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে সমাজ জীবনে সহিংসতার প্রাদুর্ভাব সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলোর সাফল্য অথবা ব্যর্থতা, তার অধঃপতন ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালনে অক্ষমতার গুরুতর কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে কিনা। বরঞ্চ আমার সেই গবেষণায় আমি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই সত্যই তুলে ধরেছি যে, রাজনৈতিক গণভিত্তি ও গণ -অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমগ্র উম্মাহর ভেতরে বিরাট পরিবর্তন এসেছে এবং সেই পরিবর্তন তার নেতৃত্বের মানের অবনতি ঘটিয়েছে, এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বিকৃত করেছে। আর এর পরিণতিতে গোটা উম্মাহ তার মনজিলে মকসুদ বা গন্তব্যস্থল থেকেই বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক বিনির্মাণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, গোটা উম্মাহর গঠন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে, তার সৃজনশীলতা ও কর্মপন্থা হ্রাস পেয়েছে। তার সামাজিক ও সামষ্টিক ঐক্য ও একাত্মতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। তার সামাজিক শৃংখলা ভেঙ্গে পড়েছে,

www.pathagar.com

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তার অবদান হ্রাস পেয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জের সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

সহিংসতার বিষয়টি কিভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো? মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের চেষ্টায় নিয়োজিত বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের তৎপরতায় আর সমাজের অভ্যন্তরে যুলুম ও অরাজকতার প্রতিরোধ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিবর্তন সূচিত করার জোর প্রচেষ্টায় তার অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে কেনই বা আমি গবেষণায় প্রবৃত হলাম ? আমি সেই সব সংঘাত-সংঘর্ষ, তার প্রতিক্রিয়া, তার প্ররোচনা দানকারী উপকরণগুলোর বিশদ বিবরণের ওপর সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজনই বা কেন অনুভব করলাম ? বিভিন্ন শাসক দল ও বিরোধীদল এই সংঘাত-সংঘর্ষ সৃষ্টিতে যে ভূমিকা পালন করে, প্রত্যেক দল ও গ্রুপ নিজ নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করার নিমিত্তে সংঘাত-সংঘর্ষ নিরসনে যে পদ্ধতি ও উপায় উপকরণ অবলম্বন করে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ওপর কেন গুরুত্ব দিলাম ? পরিবর্তন ও সংস্কার-সংশোধন সফল করতে সংস্কার বাদীরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে, তার ফলাফল নিয়েই বা আমার এত মাথাব্যথা হওয়ার কারণ কি ? এর প্রত্যেক্ষ কারণ হলো, কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে বিপর্যয়সমূহ নিয়ে রসূলের (সা) যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, আমি তার মধ্য থেকে একটা বিখ্যাত হাদিস শুনেছিলাম। রাসূল (সা) কোন এক জুময়ার ভাষণে এ কথাটা বলেছিলেন এই ভাষণ শ্রবণের সময় এ হাদিসের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেনি। কেননা এই হাদিস ও কেয়ামত প্রাক্কালীন বিপর্যয়গুলোর বিবরণ সম্বলিত অনুরূপ অন্যান্য হাদিস ইসলামী সাহিত্যের এমন উপাদান যা আমাদের অনেকের সামনে হরহামেশাই উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু সেদিন জুময়ার খুতবা শোনার সময় এ হাদিসটি পুনরায় স্মরণ হওয়ায় হাদিসটি নিয়ে গভীর চিন্তা গবেষণা করার প্রেরণা পেলাম। আবু দাউদ শরীফে উদ্ধৃত এই হাদিসটি হলো ঃ হযরত আবু যর বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) আমাকে বললেন ঃ "হে আবু যর" আমি বললামঃ "হে রসূল্লাহ, আমি উপস্থিত। তিনি বললেন ঃ "যখন মানুষের ওপর এমন ভাবে মৃত্যু আসে যে বাড়ি, কবরে পরিণত হয় (অর্থাৎ বাড়ির সবাই মৃত্যুবরণ করে) তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে? আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তার রসূলই ভালো জানেন, অথবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমার জন্য যা পছন্দ করেন, তাই হবে"। তিনি বললেন "তখন ধৈর্য ধারণ করাই হবে তোমার কর্তব্য" অথবা তিনি বললেন ঃ তুমি ধৈর্য ধারণ করবে। তিনি পুনরায় বললেনঃ যখন তুমি দেখবে, তেলের পাথরগুলো রক্তের মধ্যে ডুবে গেছে, তখন তুমি কী

www.pathagar.com

করে? আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তার রসূল যা ভালো মনে করেন, তাই করবো। তিনি বললেনঃ সমাজের অন্য সবাই যা করবে, তুমি কি তাই করবে ? আমি বললাম ঃ এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কী ? তিনি বললেন ঃ তুমি নিজরে ঘরে অন্তরীণ হয়ে যেও। আমি বললামঃ যদি তা (সংঘাত-সংঘর্ষ) আমার ঘরে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়, তাহলে ? তিনি বললেন ঃ তোমার যদি আশংকা হয় যে, তরবারীর তীব্র আলোকরশ্মী তোমার চোখকে ঝলসে দেবে, তাহলে কাপড় দিয়ে তোমার মুখ ঢেকে নিও। আক্রমণকারী তোমার পাপ ও নিজের পাপ- উভয়টার জন্য দায়ী হবে।

এ হাদিসটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে মনে হয়, আমরা যেমনটি ভাবি এবং ইতিহাসের বন্ধ ঘটনায় যেমনটি বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে, অর্থাৎ বিপথগামিতা ও দুস্কৃতিকে সর্ব প্রকারের নৈতিক ও বস্তুগত উপকরণ দিয়ে প্রতিহত করতে হবে।এ ধারণা সঠিক নয়। উপরন্তু এ হাদিসে যে বিস্ময়কর বিষয়টির সাক্ষাত পাওয়া যায়, তা হলো, এ হাদিস শুধু প্রথম আক্রমণকেই নিষিদ্ধ করে না, বরং সব প্রকারের সহিংস কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করে, এমনকি সহিংস আক্রমণকে প্রতিহত করার নামে এবং আত্মরক্ষার নামে যে সহিংসতা চালানো হয়, তাকেও নিষিদ্ধ করে।

ঐ জুময়ার ভাষণটি শ্রবণের সময় আমি যে চিন্তা-গবেষণা চালাই, তাতে দেখতে পাই যে, এ হাদিস ও তার অন্তর্নিহিত শিক্ষার ভেতরে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, যা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা না করে সামনে অগ্রসর হওয়া সমীচীন নয়। বিশেষত, মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস যে রক্তক্ষয়ী, সংঘাত-সংঘর্ষে ও বিপর্যকর ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ এই ঐতিহাসিক সত্যটাও উপলব্ধি করা দরকার। সেই সাথে এটাও বুঝা দরকার যে, ইসলামী রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনগুলোর বেশির ভাগই এ যাবত ব্যর্থ হয়েছে।

এ জন্য রসূল (সা) তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলোতে নিজের উম্মতকে সম্বোধন করে যে কথাগুলো বলেছেন, তার নিগুঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করার সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করা আমি আবশ্যক বলে মনে করি। কেননা তিনি নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, এ উম্মাতের অধোপতনের দিন ঘনিয়ে আসছে। আর এই অধোপতনের পরবর্তী পর্যায়ে কী হবে, তাও তিনি তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছেন।

প্রতিপাদ্য যে জিনিসটি আমাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে তা হচ্ছে, আমার চিন্তাধারা অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণের পক্ষপাতী নয় এবং বিষয়গুলোর বৃহত্তম প্রেক্ষাপটের অনুপস্থিতিতে বিস্তারিত খুঁটিনাটিতে হারিয়ে যেতেও রাজী নয়।

www.pathagar.com

এই চিন্তাধারার ভিত্তিতেই আমি এই হাদিস ও এর তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা গবেষণায় নিয়োজিত হই এবং ইসলামের অভ্যুদয়ের ঘটনাবলীর বৃহত্তম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অনুসন্ধানে লিপ্ত হই। ইসলাম মানব সমাজে যে পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়িত করতে ইচ্ছুক, তা সে কোন্ পদ্ধতিতে করতে চায়, মক্কায় ইসলামী সমাজ ও মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে রসূল (সা) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কারকামী লড়াইকে কিভাবে পরিচালনা করেছেন এবং কিভাবে তিনি তার অনবরত প্রতিবেশী শত্রুমিত্র ও অমুসলিমদের সাথে আচরণ করেছেন, তা নিয়ে চিন্তা ঘবেষণা চালাই।

একমাত্র এই বৃহত্তম প্রেক্ষাপট এবং রসূল (সা) এর জীবদ্দশায় পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই রসূল (সা) এর জীবদ্ধশায় সংঘটিত গঠনাবলী ও তার তাৎপর্যকে সার্থকভাবে, ভারসাম্যপূর্ণভাবে ও নূন্যতম ভুল ভ্রান্তির ঝুঁকি নিয়ে বুঝা সম্ভব।

এ জন্যই আমি রসূল (স) এর মক্কী জীবন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা শুরু করেছি। কেননা এই মক্কী জীবনেই তিনি ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেনে। আর এই ইসলামের দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজ থেকে যাবতীয় গোমরাহী, দুষ্কৃতি, দুর্নীতি ও নৈরাজ্য দূর করে সামজ সংস্কার করেন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

আমি আরো চিন্তা-গবেষণা চালাই মক্কী সমাজের অনুসৃত জীবন পদ্ধতির ওপর রসূলের (স) দাওয়াতের প্রভাব এবং এই দাওয়াতের সুদূরপ্রসারী আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে। আমি রাসূলের (সা) সেই কর্মপদ্ধতিও পর্যালোচনা করেছি যা তিনি সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে, রাজনৈতিক ও আদর্শিক সংঘাত নিরসনে প্রয়োগ করেন। আরবের জাহেলী সমাজে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ফলে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল। তাঁর দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সবচেয়ে ব্যাপক ও সবচেয়ে গভীর সংস্কার ও সংশোধন করা।

এরপর রসূল (সা) মক্কা থেকে বেরিয়ে মদিনায় হিজরত করার পর তিনি সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে যে কর্মপন্থা অনুসরণ ও যে উপায় উপকরণ প্রয়োগ করেন, আমি তাও পর্যালোচনা করেছি। মক্কার শেরক ও যুলুমের রাজ্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশে তিনি মদিনায় ইসলাম ও ন্যায় বিচারের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। আমি এ বিরষটিও পর্যালোচনা করেছি যে, রাসুল (স) মদিনায় হিজরত করার আগে মক্কায় যে কর্মনীতি অনুসরণ করতেন, হিজরতের পর মদিনায় গিয়ে মক্কার মোশরেকদের ও মদিনার মুসলমানদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে তার সেই কর্মপন্থা কিভাবে পাল্টে গেল।

www.pathagar.com

আমার প্রতিপাদ্য প্রশ্ন ছিল মক্কী সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আভ্যন্তরীণ চরিত্রই কি রসূল (সা) কে মক্কী সমাজে ধৈর্য ও শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের কর্মপন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করেছিল ? সেই সমাজে মুসলমান ও মোশরেকরা রক্ত সম্পর্ক ও একই সমাজের সদস্য হওয়ার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। আরো একটা প্রশ্ন ছিল এই যে, একই সমাজের অভ্যন্তরে, দুটো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সংঘর্ষমুখর গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্বাসনের পদ্ধতি পরিবর্তনের কারণটি কি তাদের রাজনৈতি ও আদর্শিক বিভিন্নতা ও তা থেকে উদ্ভূত প্রত্যেক সমাজের ও তার ওপর আধিপত্যশীল বুদ্ধিজীবীদের ভাবাবেগ এবং বস্তুগত ও নৈতিক স্বার্থে বিভিন্নতার নিয়ামক ?

অনুরূপভাবে, মদিনার রাষ্ট্র ও সমাজে বসবাসকারী মুসলমান ও প্রতিবেশী ইহুদীদের মাঝে, কোরায়শী মোহাজের ও আওস-খাজরাজীয় আনসারদের মাঝে এবং মুসলমান ও মসুলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন মোনাফেকদের মাঝে গোত্রীয়, সাম্প্রদায়িক ও আদর্শিক পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও সম্পর্ক বন্ধনসহ সকল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে রসূল (সা) এর অনুসৃত কর্মপদ্ধতি ও উপায় উপকরণ নিয়েও আমি অনুসন্ধান চালিয়েছি। এই অনুসন্ধান চালিয়ে আমি দেখতে চেয়েছি যে, সমাজের ভেতরকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের যে পদ্ধতি ইতিপূর্বে মক্কায় অনুসৃত হতে দেখা গেছে, তা মদিনায় অনুসৃত হয়েছে কিনা। মক্কায় তো একটা অখন্ড সমাজের সমস্যাবলী মোকাবিলা করার জন্য সহিংস পন্থা এড়িয়ে চলা হতো, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে রাজনৈতিক সমাধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই অপরিহার্য গণ্য হতো এবং যে কোন বিপথগামিতার প্রতিকারে মুসলমানদের যে কোন দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সহিংস পন্থা বর্জন করা হতো। উম্মাতের ও জননেতৃত্বের দয়াদ্রতা ও পরামর্শ ব্যবস্থার কারণে কোন কঠোরতা ও সহিংসতার প্রয়োজন হতো না।

এই বৃহত্তম প্রেক্ষাপটে এবং এই প্রেক্ষাপট সৃষ্টিকারী তার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন উপকরণের আলোকে আমি বিশ্বনবীর নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহ ও তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি। এই তাৎপর্যই ঘটনাবলীর মর্ম নির্ধারণ করে, এই নীতিমালার মর্ম নির্ধারণ করে, সেই সব কর্মপদ্ধতি ও উপায়-উপকরণ অবলম্বনের কারণ সমূহ চিহ্নিত করে, যা রসূল (সা) ইসলামী আন্দোলনের ইপ্সিত সংস্কারমুখী সংগ্রাম পরিচালনার প্রতিটি পর্যায়ে অবলম্বন করতেন।

এই পর্যালোচনা ও তত্ত্বানুসন্ধান এবং সেই বৃহত্তম প্রেক্ষাপটের প্রতি সর্বাত্মক বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিপাত, যা ঘটনাবলীর তাৎপর্য ও রসূলের সমগ্র দাওয়াতী জীবন

www.pathagar.com

ব্যাপী এমনকি তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত অনুসৃত নীতিমালার প্রকৃত মর্মের সন্তোষজনক উপলব্ধিতে সহায়ক হয়েছিল, তার ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, তা লেখককে এ বিষয়ে কলম ধারণ করতে ও এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্পর্কে এই পুস্তকে আলোকপাত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এই গবেষণার ফলাফল থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম ও ইসলামের নবী ইসলামী সংস্কার সাধন ও দুর্নীতি-অরাজকতার প্রতিরোধের উদ্দেশে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মূলনীতি পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল অনুসরণ করতেন।

উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূলনীতি স্থায়ী হলেও পরিকল্পনা, ও রাষ্ট্রীয় নীতি এমন কোন স্থবির পরিকল্পনা ও নীতি ছিল না, যা বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির মৌলিক চরিত্রকে উপেক্ষা করবে। বস্তুত উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বিদ্যমান পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী গঠিত হয়, যাতে তা বিদ্যমান পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অথচ তার স্থায়ী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ক্ষুণ্ন করে না এবং তার সেই সব মূল স্তম্ভগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ করে না, যা তার সংস্কারধর্মী লক্ষ্যগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে এবং সর্বাধিক পরিমাণ কার্যকরিতা সহকারে নিশ্চিত করে।

রসূল (সা) এর অনুসৃত নীতিমালা ও এই নীতিমালার পেছনে মদিনায় কোরআনী দিকনির্দেশনার মধ্য দিয়ে লেখকের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্র ও আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্র এক নয়। কেননা প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী মৌলিক উপাদানগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাবশালী মৌলিক উপাদানগুলো থেকে ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী। কারণ প্রত্যেক ময়দান ও পরিবেশ পরিস্থিতি সেখানকার স্বভাব-প্রকৃতি দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে, এই বিশ্লেষণধর্মী সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী অবদানের ফলে আমি বুঝতে পেরেছি যে, পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত আয়াত বা হাদিস সমূহকে একই সাথে অনুসরণ বা প্রয়োগ করা যায় না। এক সাথে অনুসরণ বা প্রয়োগ করতে হলে সেগুলোকে কাঁটছাট রহিত করা, অথবা তার অর্থ ও মর্ম ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এর ফলে নানা রকমের প্রশ্নের উদ্ভব হয়। বর্ণিত ব্যাখ্যা বা কাঁটছাট অনেকের মনঃপুত হয়না, অনেকের বোধগম্য হয় না, এবং ঐ সব আয়াত বা হাদিসকে খন্ড বিখন্ড করা ছাড়া ক্ষেত্রলোকে কার্যপযোগী বানানো যায় না, আর এর ফলে যে কোন কুচক্রী ইসলামের ওপর আগ্রাসন চালানোর সুযোগ পেতে পারে বা তার ওপর ভিত্তি করে যে কোন তার্কিক তার মতলব অনুযায়ী যে কোন মতের সপক্ষে প্রমাণ দর্শাতে পারে।

www.pathagar.com

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, কোন সমাজে কোন রাজনৈকি সমস্যার গঠনমূলক ও ইতিবাচক সমাধান কেবল রাজনৈতিকভাবেই দেয়া সম্ভব। আর সমাজের সাধারণ রাজনৈতিক ধরনের যে কোন সমস্যায় শাসক দল বা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া কোন সমাধানকে আইনগত বৈধতা দেয়া যায় না। সংস্কার বা পরিবর্তনের যে পদক্ষেপই নেয়া হোক না কেন, মানব সমাজে তাকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে অবশ্যই শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও ধৈর্যের সাথে তার উপায় উপকরন প্রয়োগ করতে হবে। আর সে সমাজ বা রাষ্ট্র পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায় উপকরণের বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে, তা তার সভ্যতা বিনির্মাণের সংগ্রামে অবশ্যই সফল হবে এবং পরামর্শ ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে এ ধরনের সাজের কোন দল বা গোষ্ঠী যদি এই পথ ত্যাগ করে এবং ধৈর্যশীল সংস্কারকামীদের ওপর আগ্রাসন চালায় ও সহিংসতা প্রয়োগ করে, তাহলে জাতি তাদের আগ্রাসী আক্রমণের সীমা বেধে দেবেই। মোটকথা, পরামর্শ, সামষ্টিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক উন্নয়ন ও জাতি গঠন মূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মাধ্যমে সফল রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পরামর্শভিত্তিক পদ্ধতি ছাড়া আর কোন সুষ্ঠু ও নির্ভুল পদ্ধতি নেই।

ইতিপূর্বে আমি ইসলামী ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট থেকে প্রকাশিত *AMERICAN JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL SCIENCES (AJISS)* এ একটা ইংরেজি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। ঐ পত্রিকাটি আমেরিকার মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানীদের সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালে ৮ম ভলিউমের ২য় সংখ্যায় এটা ছাপা হয়েছিল। ঐ জার্নালটি এই বিষয়েই লিখিত হয়েছিল এবং তা ছিল ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে গবেষণা চালিয়ে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তারই মূল কথা।

ইদানিং আরব ও ইসলামী বিশ্বে বিশেষভাবে সহিংসতা নিয়ে যে আলোচনা চলছে, যে সহিংসতা বহু সংখ্যক আরব ও মুসলিম দেশের শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে, তাদের দৃষ্টিকে বিপন্ন করে তুলেছে, তাদের শক্তি ও মনোবল ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে, সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে "গণতন্ত্রের" স্লোগান নিয়ে বিশ্বময় যে আলোচনা চলছে, তাতেও অংশ গ্রহণ করা এ নিবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য। পাশ্চাত্য তথ্যমাধ্যমগুলো "গণতন্ত্র" নিয়ে শোরগোল করেই চলেছে। আর আরব ও মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক তথ্য মাধ্যমগুলোর অনুকরণ ও অনুসরণ করে যাচ্ছে। এ সব তথ্য মাধ্যম এই সব দেশে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে

www.pathagar.com

হস্তক্ষেপের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দুঃখের বিষয় যে, এ সব আরব ও মুসলিম দেশের বহু তথ্যমাধ্যম সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে ও সুযোগ সন্ধানী মনোভাব নিয়ে পাশ্চাত্য তথ্য মাধ্যমের সাথে সুর মেলাচ্ছে। এর কারন এই যে, যখন তখন এসব দেশের সরকারগুলোর পতন ঘটে এবং জনগণ বলপ্রয়োগ, সন্ত্রাস, শোষণ-যুলুম ও দুর্নীতির কবলে পড়ে নাজেহাল হয়। এই পটভূমিতেই আমি এই বিষয়ে আরো সম্প্রসারিত আকারে আরবী ভাষায় "ইসলামীয়াতুল মারিফাহ্" নামক পত্রিকায় একটা নিবন্ধ নতুন করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইসলামিক থ্যট ১৯৯১ সালের শীতকালে প্রকাশিত AJISS এর ১৫তম সংখ্যায় এটা ছাপা হয়েছে।

এই পুস্তকে বিষয়টি অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আমি সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ও হাদিসসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সেই সব মূলনীতিকে আমি যুতটুকু বুঝেছি, ততটুকু তুলে ধরেছি। মুসলিম উম্মাহর কর্মকাণ্ডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের ব্যাখ্যায় এই মূলনীতিগুলো সহায়ক বলে আমি মনে করি। বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসা তাদের কিছু ভুল বুঝাবুঝি ও ভ্রান্ত কার্যক্রমের ফলে উম্মার ইতিহাসের বহু রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন তার বৃহত্তম লক্ষ্যে উপনীত হতে, উম্মাহর উত্থান ও সংস্কারকে কার্যকর করতে এবং তার সকল স্তরে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরঞ্চ এ কথা বলা হয়তো অতিশয়েক্তি হবে না যে, সেই সব ভ্রান্ত সহিংস কর্মকাণ্ড মুসলমানদের বহু সরকারে ও রাজনৈতিক সংগঠনে সহিংসতা, বলপ্রয়োগ, দুর্নীতি উশৃঙ্খলতা ও স্বৈরাচারকে পাকাপোক্ত করেছে।

মুসলিম উম্মাহর জন্য তার চিন্তা পদ্ধতির সংস্কার ও সংশোধনের গবেষণালোকে সফল করার জন্য শান্তিপূর্ণ, পরামর্শ ভিত্তিক ও শিক্ষামূলক কর্মপন্থা অনুসরণের বাধ্যবাধকতা মেনে চলা ছাড়া আর কোন সক্রিয় পথ খোলা আছে বলে আমার মনে হয় না। একমাত্র এই পথেই খেলাফত, হেদায়াত ও পুনর্গঠনের যোগ্য মানুষ পুনরায় তৈরি করা সম্ভব।

মহান আল্লাহর নিকট আমার কামনা, তিনি যেন আমাদেরকে ও গোটা মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তিনি তো সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সহিংসতা

খেলাফতে রাশেদার পতন, হযরত ইমাম হুসাইন বিন আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও মুহাম্মাদ বিন নাফসি যাকিয়ার বিদ্রোহ, উমাইয়া সাম্রাজ্য ও উমাইয়ার অভিন্ন চরিত্রধারী আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন সহ এক শতাব্দিব্যাপী রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের পর মদিনার চিন্তাধারার ধারকগণ (১) এই মর্মে ফতোয়া ঘোষণা করেন যে, সমাজে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং শাসক যদি অত্যাচারী হয়, তবুও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম।

মাদানী চিন্তাধারার ধারকগণের এই নীতির অর্থ এ নয় যে, তারা যুলুম-অত্যাচারকে ভালোবাসেন কিংবা তার প্রতি উদাসীন। আসলে এটা ছিল স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত সংস্কারমূলক বিপ্লবগুলোর ব্যর্থতার স্বাভাবিক ফল। তখন এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এই সব বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ দ্বারা কোন চূড়ান্ত ফলাফল অর্জিত হয়নি এবং বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও সূচিত হয়নি। রক্তপাত ছাড়া এগুলো দ্বারা আর কিছুই লাভ হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটেই মাদানী চিন্তাধারার ধারক ইসলামপন্থীগণ স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিপ্লব, বিদ্রোহ ও প্রত্যাখানের নীতি বর্জন করতঃ রক্তপাত এড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধিতা করা, সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে নিভৃত জীবন যাপন করা, এবং ক্ষমতাসীনদের অধীনেই শরীয়তের মূলনীতি সমূহ ও ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক ধারাগুলোর মধ্য থেকে যতগুলোকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়, সংরক্ষণ করা কর্তব্য। এ কারণেই মাদানী চিন্তাধারার ধারকগণ, যাদেরকে প্রচলিত পরিভাষায় "ওলামা" বলা হয় এবং যারা মুসলিম উম্মাহর

'মদিনার চিন্তাধারা ও ইসলামপন্থী" এই দুটো পরিভাষা দ্বারা রসুল (স) এর সুন্না ও খেলাফাতে রাশেদার অনুসারী ইসলামী চিন্তাধারাকে বুঝানো হয় যা বর্ণীয়, বংশীয়, গোত্রীয় ও স্বৈরতান্ত্রিক ভাবধারাকে প্রত্যাখান করে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিতআলোচনার জন্য লেখকের "আযমাতুল আকলিল মুসলিম" (মুসলিম বিবেকের উভয় সংকট) নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

অধিকাংশ বিদ্বানদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাদের সর্বোপেক্ষা শীর্ষস্থানীয় একজন ইমাম আবু হানিফা নুমান॥ আব্বাসীয় শাসকদের অধীনে বিচারপতির পদ গ্রহণে রাজী না হওয়ায় তাকে কারাগারে ঢুকানো হয়।

"ওলামা" উপাধিতে ভূষিতএই সব মুসলিম বিদ্বান ও পন্ডিতগনের মাঝে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা শাসকদের মাঝে এই বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার ফলে ওলামা সম্প্রদায় মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী শরিয়তের বিধান বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত হন এবং তাদের ইসলামী জ্ঞান, আন্তরিকতা ও সততার কারণে তারা তাদের বেছে নেয়া এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে সফল হন। আর দেশের শাসনকার্য পরিচালনার কাজ, রাজা ও সুলতানদের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং ঐ শাসকরা তাদের সে কাজ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে ও নিজেদের প্রবৃত্তির খেয়ালখুশি মোতাবেক পরিচালনা করতে থাকেন। এর ফলে মুসলিম স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা, পরবর্তীকালে শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ক্ষমতার লাগামহীন অপব্যবহারের হাতিয়ারে পরিণত করে। এই স্বেচ্ছাচারী মানসিকতার কারণ যাই হোক, বিরাজমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ ধরনের স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা মুসলমানদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও মানসিকতা গঠনে সমাজ ও রাষ্ট্রের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার প্রধান উপাদান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। শাসকদের এই স্বেচ্ছাচারিতা শাসন ব্যবস্থা ও জনস্বার্থের প্রতি মুসলমানদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংঙ্গিকেও নেতিবাচক বানিয়ে দেয়।'

প্রকৃত পক্ষে আলেমদের পক্ষ থেকে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানী সহকারে সমালোচনা না করা এবং বিদ্রোহকে বিশৃংখলা ও প্রত্যাখ্যাত পন্থা হিসাবে বিবেচনা করার কারণ এটা ছিল না যে, তারা অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সহিংসতা পরিচালনা করাকে নীতিগতভাবে অন্যায় বিবেচনা করতেন। বরঞ্চ এটা ছিল মূলতঃ তাদের বাস্তব পরস্থিতির কাছে আত্ম সমর্পণের শামিল। কেননা এটা না করে তাদের কোন উপায় ছিলনা। এটাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর। অর্থাৎ সংস্কারকামী আলেমদের পক্ষ থেকে সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে সহিংস পন্থা অবলম্বন না করার পথ কেবল বাধ্য হয়েই বেছে নিতে হয়েছিল, নীতিগতভাবে সেটাই করা উচিত বলে নয়।

আমার ধারণা, মূলতঃ তিনটি সমস্যার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলার কারণেই এই দোদুল্যমান ও অস্পষ্ট ভূমিকার উদ্ভব হয়েছে ঃ প্রথমত মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরে অথবা রাজনৈতিক সমাজের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক দ্বন্দ-সংঘাত, দ্বিতীয় পরস্পর বিরোধী জাতি ও সমাজগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং তৃতীয়ত সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, মহৎ নৈতিক

www.pathagar.com

চরিত্র অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা, অথবা যুলুম নির্যাতনের নিন্দা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান ও চেষ্টা সম্বলিত প্রতিরোধ সংগ্রাম।

আর এই তালগোল পাকানোর বাস্তব ফল এই যে, আদর্শিক বিচার বিবেচনা এতটা জট পাকিয়ে যাবে যে, এই সব পরিস্থিতিতে সহিংস পন্থা অবলম্বন করা ও না করা সমান হয়ে যাবে। আর সমাজের অভ্যন্তরে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, অথবা যে কোন পর্যায়েও যে কোন উদ্দেশে সহিংস পন্থা অবলম্বন অথবা বর্জন করা হোক না কেন সর্বাবস্থায়ই তা একটা (কৌশলগত) নীতির পর্যায়ে উন্নীত হবে। নীতি বলতে আমরা এমন স্থায়ী জিনিসকে বুঝাচ্ছি যা পরিস্থিতি, পরিবেশ ও তার শক্তিমত্তার হ্রাস বৃদ্ধি যতই ঘটুক তা কখনো পরিবর্তিত হয় না।

উল্লেখিত তিন অবস্থার প্রত্যেকটিতে সহিংসতার স্থান নির্ণয়ে এই দোদুল্যমানতা অস্পষ্টতা থেকেই জানা যায় কী কারণে মুসলিম জনতা অত্যাচারী শাসকদের মোকাবিলায় আত্মসমর্পণ, শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ এই তিনটের একটাকে বাছাই করার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। তবে এ ক্ষেত্রে তারা একই সমাজ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংস্কার, পরস্পর বিরোধী একাধিক সমাজ ও রাষ্ট্রের মাঝে রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ, সৎ কাজের প্রতি আহ্বান অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে প্রকাশ্যে হক কথা বলা, যুলুম অত্যাচারের প্রতিরোধ এবং মহৎ চরিত্র অর্জনে উৎসাহিত করার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। বলাবাহুল্য, সংস্কার কার্যক্রমের এই সব কটা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিই সরকার ও আইনসংগত রাজনীতির সাথে সমন্বয়ের সীমার ভেতরে থেকেই অবলম্বন করা যায়। কখনো তা সমাজের অভ্যন্তরে, রাজনৈতিক সংঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে না।

সব ধরনের রাজনৈতিক বিরোধ ও দাওয়াতী লড়াইতে সেচ্ছামূলক অথবা নীতিগত ভাবে সহিংসতা প্রয়োগে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগা অনেক ক্ষেত্রে আজও পর্যন্ত মুসলমানদের স্বভাব রয়ে গেছে যদিও বহু শতাব্দি অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই গুরুতর ও বিপজ্জনক ব্যাপারে বিচার বিবেচনা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকার কারণে দুঃখজনকভাবে এখনো বহু রক্তক্ষয়ী ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ তাতে কোন সুফল লাভ হচ্ছেনা কিংবা কোন বিরোধের মীমাংসাও হচ্ছে না। আর এ সব রক্তক্ষয়ী সংঘাত-সংঘর্ষ সত্ত্বেও শাসকদের অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী স্বভাবও যথারীতি বহাল থেকে যাচ্ছে।

এ বিষয়টি নিষ্পত্তির উদ্দেশে এবং রক্তপাত কমানোর লক্ষ্যে রসূল (স) এর যুগের এবং তার পরবর্তী মুসলিম শাসনকালের ইতিহাসের শিক্ষা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধভাবে এতদসংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর

www.pathagar.com

ওপর খোলাখুলিভাবে সুশৃংখলভাবে ও সঠিকভাবে চিন্তা গবেষণা চালানো প্রয়োজন। কারণ সার্বিকভাবে ও তাত্ত্বিক শৃংখলা সহকারে অধ্যয়ন করাই হলো রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসা এবং মুসলিম সমাজে পারস্পরিক উপদেশ দানের প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার লক্ষ্যে সহিংসতা প্রয়োগ সম্পর্কে মৌলিক ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সঠিক পথ।

আমরা যখন কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদিসগুলোর ওপর সঠিকভাবে ও সুশৃংখলভাবে দৃষ্টি দেই, তখন দেখতে পাই, ওগুলোতে বহু সংখ্যক লক্ষ্যণীয় জিনিসের উল্লেখ রয়েছে এবং ঐসব হাদিস ও আয়াত তার প্রতিপাদ্য মূলনীতি ও তত্ত্ব সমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে। এতটা সাহায্য করে যে, সহিংসতার প্রকারভেদ, স্তরভেদ ও তীব্রতার তারতম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মুসলিম শ্রেণীগোষ্ঠী ও জাতি সমূহের ওপর এর অপব্যবহার হ্রাস করার তাগিদ অনুভূত হয়। অনুরূপভাবে ঐসব আয়াত ও হাদীস এমন নীতিমালা রচনায় সাহায্য করে, যা যুলুম, অত্যাচার ও স্বৈরাচারকে সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণ করতে শিখায়।

এ সব আয়াত ও হাদিস পাঠককে এই মর্মে সচেতন করে যে, কোরআনের আয়াত ও রসূলের হাদীস একই সমাজের অভ্যন্তরে পরিচালিত রাজনৈতিক লড়াই এর মাঝে এবং একাধিক রাজনৈতিক সমাজ ও জাতির মাঝে সূচিত রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাঝে পার্থক্য করে। তার মাঝে ও সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ও মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের উপদেশ দানের মাঝে ও যা রাজনৈতিক সংগ্রামের এর অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে যেগুলো রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্তর্ভূক্ত। সেগুলোতে সহিংস পন্থা অবলম্বন করা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাত ও গোলযোগের শামিল। এটা সৎকাজের আদেশ দান, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ও মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের পর্যায়ে পড়ে না। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও গোলযোগ যেভাবে মীমাংসা করা হয়, এটিরও সেইভাবেই মীমাংসা করতে হবে।

সহিংসতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ও প্রতিরোধ সংগ্রাম সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস অনেক রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কতক রয়েছে রাজনৈতিক সমাজের অভ্যন্তরে সংঘটিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অত্যাচার সংক্রান্ত, তাই তা যে আকারেই হোক না কেন– দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অত্যচার নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ সংক্রন্ত এবং সেগুলোর নিষ্পত্তি ও সমাধানের লক্ষ্যে সহিংস কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত চাই তা আত্মরক্ষার নমেই করা হোক না কেন । অনুরূপভাবে জেহাদ, আগ্রাসন রোধ, এবং দুর্বল ও নির্যাতিদের সহায্যার্থে যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্পর্কেও কিছু আয়াত ও

আমরা যদি নবী যুগের সহিংসতা ও শক্তি প্রয়োগের ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিস, নীতিমান ও উপদেশ বানার মাঝে সম্পর্ক খুঁজতে চাই, তাহলে এই সব আয়াত ও হাদিসের উপর একটা ব্যাপক, সর্বাত্মক ও সুশৃংখল।

www.pathagar.com

হাদিস আমরা দেখতে পাই। আরো দেখতে পাই মুসলমানদের মধ্যে সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা সম্পর্কে কিছু আয়াত ও হাদিস। এখন প্রশ্ন এই যে, সব রকমারি আয়াত ও হাদিসের মধ্যে রাজনীতি, দাওয়া ও সৎ কাজের আদেশ দানের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় সীমার অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাবে কিভাবে ? এ প্রশ্নও জাগে যে, সেই নীতিমালা কী কী ? এই সব অবস্থার কোন একটিতেও সহিংসতা প্রয়োগের বৈধতা প্রমাণ করবে আর কোন অবস্থায় সহিংসতা প্রয়োগের অনুমতি দিলে বা না দিলে তারই বা যৌক্তিকতা ও উপাকারিতা কী ?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোরান, হাদীস ও সহিংসতার সাথে সংশ্লিষ্ট নবীযুগের ঘটনাবলীর তাৎপর্য উপলব্ধিতে ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গীর আবশ্যকতা

আমরা যদি নবী যুগের সহিংসতা ও শক্তি প্রয়োগের ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত, হাদীস, নীতিমালা ও উপদেশমালার মাঝে সম্পর্ক খুঁজতে চাই, তাহলে এসব আয়াত ও হাদীসের উপর একটা ব্যাপক, সর্বাত্মক ও সুশৃঙ্খল পর্যালোচনা ও গবেষণা চালানো জরুরি হয়ে পড়ে। যাতে এ ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট নীতিগত দৃষ্টিভংগী গড়ে তুলতে পারি। অনুরূপভাবে আয়াতগুলো ও হাদিসগুলোর মর্মোপলব্ধি ও এই সব জটিল সামাজিক বিষয়গুলোর সাথে ওগুলোর সম্পর্ক উপলব্ধি করার জন্য যে জিনিসটির প্রয়োজন তা হলো শুধুমাত্র আয়াত ও হাদিসগুলোকে অধ্যয়ন করে ক্ষান্ত থাকা যাবে না। বরঞ্চ রসূল (স) এর অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেও সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। আমরা সবাই জানি যে, রসূল (স) এর সংস্কার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তিক্ত ও প্রাণান্তকর লড়াই এবং অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছিল। লড়াইয়ে এবং সেই সব ধাপ ও স্তর নবী আদর্শকে সুসমন্বিত ও সুশৃংখল করেছে এবং এই সব পটভূমিতে মানানসই করেছে। তারপর এগুলোকে এমন একটা সমন্বিত দৃষ্টিভংগী দিয়েছে, যা নবী সংস্কার আন্দোলনকে একটা পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার রূপ দিয়েছে। এভাবে এই সুসমন্বিত আয়াত ও হাদিসগুলো মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের সমাধান ও সংস্কারমুখী লড়াই পরিচালনা খোদায়ী-নব্বী পদ্ধতির সন্ধান দেয়। সন্ধান দেয় জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ও শাসক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের শান্তিপূর্ণ উপায়ের। অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত ও দলগত পর্যায়ে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ প্রতিরোধ পরস্পরকে উপদেশ দেয়ার পথও প্রদর্শন করে, এবং বিভিন্ন গোলযোগপূর্ণ ও নির্যাতনমূলক অবস্থার মধ্যে ও রাজনৈতিক সংঘাত সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য করে।

সর্বপ্রথম যে জিনিসটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে শেষ জামানার গোলযোগপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ, যা "ফেতনার হাদিস" নামে

www.pathagar.com

পরিচিত। রসূল (সা) তাঁর ওফাতের প্রাক্কালে এগুলোর বিশদ বিবরণ দিয়ে গেছেন। এ সব হাদিস তিনি সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন গোলযোগপূর্ণ ঘটনাবলীতে সশস্ত্র লড়াইতে সশস্ত্র অবস্থায় অংশ গ্রহণ করতে। এসব হাদিসে রসূল (সা) মদিনার তাঁর সাহাবীগণকে সেইসব রাজনীতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমাধান কল্পে সহিংস পন্থা অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন, যা সমাজের অভ্যন্তরে নেতৃস্থানীয় শীর্ষ ব্যক্তিবর্গের মাঝে সংঘটিত হয়ে থাকে। তিনি বরঞ্চ পরিপূর্ণ আত্মসংযমের নির্দেশ দেন যদিও সংস্কার সংশোধনের উদ্যোক্তা ও আহ্বায়ক অন্যদের পক্ষ থেকে আগ্রাসনের শিকার হয়। প্রথমে কোরআনের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

"তুমি তাদেরকে আদমের দুই ছেলের সত্য কাহিনী শুনিয়ে দাও। তারা দু'জন যখন কোরবানী দিল, তখন তাদের একজনের কাছ থেকে তা গৃহীত হলো। কিন্তু অন্য জনের কাছ থেকে গৃহীত হলো না। সে (যার কুরবানী গৃহীত হলো না) বলল ঃ আমি তোমাকে হত্যা করবো। সে (যার কুরবানী গৃহীত হলো) বললো ঃ আল্লাহতো শুধ সংযতদের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াও। তবে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াবো না মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই, তুমি আমার পাপ ও তোমার পাপের দায় ঘাড়ে নাও, অতঃপর দোজখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হও। ওটাই হত্যাকারীদের কর্মফল। অতপর তাঁর প্রবৃত্তি তাকে তার ভাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত করলো। তাই সে তাকে হত্যা করলো ও ক্ষতিগ্রস্থ হলো।" (মায়েদা ঃ আয়াত ২৭-৩০)

"হে আমার ছেলে, তুমি নামায কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে, তাতে ধৈর্য ধারন কর। এটা হচ্ছে, দৃঢ় কল্পের কাজ। (লোকমান, আয়াত-১৭)

কোরআনের এই আয়াতগুলোর মতই কতগুলো হাদীসও উদ্ধৃত করছি।

"হযরত উসামা (রা) বলেন ঃ মদিনার একটা টিলার ওপর আবিভূত হয়ে বললেন ঃ আমি যা দেখি তা কি তোমরা দেখতে পাও ? আমি দেখতে পাচ্ছি, তেমাদরে বাড়ীর ভেতরে এমনভাবে ফেতনা বর্ষিত হচ্ছে, যেভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।"

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী হযরত আহনাফ বিন কায়েস থেকে বর্ণনা করেন "আমি এই লোকটিকে (সংঘর্ষে লিপ্ত একজনকে) সাহায্য করতে রওনা হলাম। সহসা আবু বকরের সাথে আমার সাক্ষাত হল। তিনি বরলেন ঃ কোথায় যাচ্ছ ? আমি বললাম ঃ অমুককে সাহায্য করতে। তিনি বললেন ঃ ফিরে যাও। কারণ আমি রসুল (স) কে বলতে শুনেছি! যখন দুজন মুসলমান তাদের তরবারী নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দুজনই দোজখবাসী হবে। আমি বললাম ঃ হে রসূল, হত্যাকারীর ব্যাপারটা বুঝলাম। নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী ? তিনি বললেন ঃ সে তার সাথীকে হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিল।"

ইমাম বুখারী সূরা আনদালের ৩৯ তম আয়াত "তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যতক্ষণ কোন ফেতনা অবশিষ্ট না থাকে এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ "ফেতনার বিরুদ্দে লড়াই সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন ? তিনি বললেন ঃ তুমি কি জান ফেতনা কী ? রসূল (স) মোশরেকদের বিরুদ্দে লড়াই করতেন। আসলে তাদের সামনে যাওয়াই ছিল ফেতনা। ওটা শাসকের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করার মত কোন ব্যাপার নয়।

ইমাম বুখারী হযরত ইবনে ওমর থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, ইবনে যুবাইরের ফেতনার (বিদ্রাহ) সময় তার কাছে দুই ব্যক্তি এসে বললো ঃ জনগণকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। আপনি হযরত ওমরের ছেলে ও রসুল্লাহর (স) সাহাবী। আপনি কোন কারণে বিদ্রোহ করছেন। তিনি বললো ঃ কারণ আল্লাহ আমার ওপর আমার ভাই এর রক্ত ঝরানো হারাম করেছেন। তারা উভয়ে বললেন ঃ আল্লাহ কি বলেননি যে, যতক্ষণ ফেতনা অবশিষ্ট না থাকে, ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাও ?" তিনি বললেন ঃ আমরা লড়াই করেছি, অবশেষে ফেতনা দূর হয়েছে এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়েছে। আর তোমরা লড়াই করতে চাইবে, যাতে ফেতনার সৃষ্ট হয় এবং দ্বীন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য হয়।

আবু দাউদ হযরত আবুযর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (স) আমাকে বললেনঃ হে আবু যর। আমি বললাম হে রসূল, আমি উপস্থিত। তখন তিনি বললেনঃ তোমর কেমন লাগবে যদি কখনো মানুষের ওপর এমনভাবে মৃত্যু আসে যে, তার বাড়ীই তার কবরে পরিণত হবে। অথাৎ পাইকারী হারে মৃত্যু বা হত্যাকাণ্ড ঘটবে, যার ফলে গোটা পরিবার মৃত্যুবরণ করবে। অথবা, যুলুম চলবে যে, লাশ বাড়ী থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র দাফন করার সুযোগ থাকবেনা, ফলে বাড়ীর ভেতরেই লাশ দাফন করতে হবে। আমি বললাম আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন, অতপর তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রসূল আমার জন্য যা মনোনীত

www.pathagar.com

করেন তাই হবে। রসূল (স) বললেনঃ তোমার কর্তব্য হবে ধৈয্য ধারণ করা, অথবা বললেনঃ ধৈর্য ধারণকর। তারপর পুনরায় আমাকে বললেনঃ হে আবু যর! আমি বললাম, হে রসূল, আমি উপস্থিত। তিনি বললেনঃ তোমার কেমন লাগবে, যখন দেখবে যে, তেলের পাথরগুলো রক্তের নীচে ডুবে গেছে ? আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তার রসূর আমার জন্য যা পছন্দ করবেন, তাই হবে। তিনি বললেন, তুমি কি তখন অন্যেরা যা করে, তাই করবে ? আমি বললামঃ তাহলে আপনি আমাকে কী করতে বলেন ? তিনি বললেন, তুমি ঘরে বসে থাকবে। আমি বললাম ঃ যদি তা আমার ঘরে ঢোকে ? তিনি বললেন ঃ তোমার যদি আশংকা হয় যে, তরবারীর চমক তোমার চোখ ঝলসে দেবে, তাহলে কাপড় দিয়ে তোমার মুখ ঢেকে নাও। আক্রমণকারী তোমার ও তার দু'জনেরই পাপে পাপী হবে।"

রসূল (সা) এর মক্কায় অবস্থানকালীন রিসালাতের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে মদিনায় যখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই সময় পর্যন্ত তার নবুয়তের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কোরআন-সুন্নাহর প্রতি আমরা যদি সামগ্রিক, সর্বব্যাপী ও সুগভীর দৃষ্টি দেই, তাহলে আমরা অবশ্যই দেখতে পাবো যে, প্রথমতঃ মুসলমানরা মক্কায় নিদারুন অত্যাচার ও আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল। অথচ কোরআন ও নবুয়তের শিক্ষা ছিল এই যে, সত্যের পথে দাওয়াত দেয়া অব্যাহত রাখতে হবে এবং সহিংস পন্থায় জবাব দেয়া চলবে না- চাই কোরায়েশ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে যত নির্যাতন ও আগ্রাসনই মুসলমানদের ওপর চালানো হোক না কেন। মুসলমানদের ওপর তাদের অত্যাচার ও নির্যাতন এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে দৈহিক নিপীড়ন চালাতে ও হত্যা করতেও পর্যন্ত কুণ্ঠিত হচ্ছিল না। এটা সুস্পষ্ট যে, এই অবস্থায়ও অহিংস পন্থায় দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া সর্বোচ্চ পর্যায়ের সৎকাজের আদেশ দান, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করণ, আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দান, এবং রাজনৈতিক আদর্শিক পর্যায়ে যুলুম ও শেরক প্রতিহত করার শামিল ছিল। এটা ছিল সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী কোরায়েশী নেতৃত্বের মাঝে ও মুসলিম সংস্কারবাদ নেতৃত্বের মাঝে দুর্দান্ত লড়াই।

মক্কায় মুসলমানদের ওপর কোরায়েশের অত্যাচারের জবাবে পাল্টা সহিংস পন্থায় আশ্রয় নেয়ার অনুমতি না দেয়ার ব্যাপারে কোরআন ও নবুয়তের শিক্ষা হমরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব ও ওমর ইবনুল খাত্তাবের মত দুঃসাহসী বীর পুরুষদের ইসলাম গ্রহণ সত্ত্বেও পরিবর্তিত হয়নি। সংস্কারবাদী সৎকাজের আদেশ দানকারী অষৎ কাজ থেকে নিষেধকারী ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে এই দু-সাহসী বীরদ্বয় কোরায়েশ নেতাদেরকে চ্যালেঞ্জ

www.pathagar.com

দিতে চেয়েছিলেন। তারা কোরায়েশদের অত্যাচার প্রতিহত করা, সহিংসতা দিয়ে সহিংসতার জবাব দেয়া, এবং শক্তি দিয়ে শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রসূল (সা) এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। অথচ কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহর এই আদেশ ও রসূলের এই নীতি আদর্শের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, ঐ অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এই নীতি ও আর্দশ নিম্নের আয়াতগুলোতে লক্ষণীয় ঃ

"অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তুমি তোমার গুনাহর জন্য ক্ষমা চাও, এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা কর সকালে ও সন্ধ্যায়।" (সূরা গাফের ঃ ৫৫)

"আর তুমি তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাক এবং একাগ্র চিত্তে তারই প্রতি রুজু হয়ে থাক। তিনিই উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। কাজেই তাকে ব্যবস্থাপক রূপে গ্রহণ কর। তারা যা বলে, তার ওপর ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চল। আর আমাকে ও সম্পদশালী সত্য প্রত্যাখানকারীদেরকে ছেড়ে দাও, আর তাদেরকে আরো কিছুকাল অবকাশ দাও।" (সূরা মুয়ামমিল ঃ ৮-১১)

"আর আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকারের উদাহরণ দিয়েছি। তুমি যদি তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শনাবলীও নিয়ে এস সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা অবশ্যই বলবে যে, তোমরা বাতিলপন্থী ছাড়া আর কিছু নও এভাবেই আল্লাহ অজ্ঞ লোকদের হৃদয়ের ওপর সিল মেরে দিয়েছেন। অতএব ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা অবিশ্বাসী, তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। (সূরা আর রুম ঃ ৫৮-৬০)

"হে আমার ছেলে, নামায কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং তুমি যে সব বিপদে আক্রান্ত হও, তার ওপর ধৈর্য ধারণ কর। এ হলো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" (লুকমান ঃ ১৭)

"বল, হে মানব জাতি, তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহে লিপ্ত হয়ে থাকে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা

www.pathagar.com

যার ইবাদাত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না। বরং আমি ইবাদাত করি আল্লাহর। যিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেন। আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি মুমীনদের অন্তর্ভুক্ত হই। আর যেন তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাক, এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত না হও। আল্লাহ ছাড়া অন্য এমন কাউকে ডেকনা, যে তোমার উপকারও করে না। অপকারও করেনা। তুমি যদি তা কর, তবে তুমি যালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন, তবে তিনি ছাড়া তা আর কেউ প্রতিহত করতে পারে না। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান, তবে তার অনুগ্রহ, রদ করাও কেউ নেই। তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ দান করেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তুমি বলে দাও, হে মানব জাতি, তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সুপথে চলেছে, সে কেবল নিজের কল্যাণেই সুপথে চলেছে। আর যে ব্যক্তি বিপথগামী হয়েছে, সে নিজের অকল্যাণের জন্যই বিপথগামী হয়েছে। আর আমি তোমাদের জন্য দায়িত্বশীল নই। আর তুমি তোমার কাছে যা কিছু ওহি আসে তার অনুসরণ কর, এবং ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ আল্লাহ নিষ্পত্তি না করে দেন। তিনি সর্বোত্তম নিষ্পত্তিকারী।" (ইউনুসঃ ১০৪-১০৯)

"আমার বান্দাদের একটা দল বলতোঃ "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের ওপর দয়া করুন, আপনি তো সর্বোত্তম দয়ালু। কিন্তু তোমরা তাদেরকে উপহাসের পাত্ররূপে গ্রহণ করেছ, শেষ পর্যন্ত তারা তোমাদের স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়েছে এবং তোমরা তার প্রতি বিদ্রুপ করতে। তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল বিধায় আমি তাদেরকে আজ কর্মফল দেব। কেননা তারা সফলকাম।" (মুমীনুন ঃ ১০৯-১১১)

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখতে পাই, মুসলমানরা মদিনায় হিজরত করা ও সেখানে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর কিভাবে রসূল (সা) ও মুসলমানদের নীতি পাল্টে গেল, কোরায়েশ নেতৃত্বাধীন আগ্রাসী হানাদারদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রয়োগের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, এবং কিভাবে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষে পরিণত হলো। এ সময়ে কোরআন মুসলমানদেরকে তাদের জানমাল ও আন্দোলন রক্ষার্থে সশস্ত্র লড়াই এর শুধু অনুমতি নয় বরং হুকুম দিল।

www.pathagar.com

রসূল (সা) কোরায়েশ ও কোরায়েশ ছাড়া অন্যান্য সেই সব গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন, যারা তার ও তার সংস্কারবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। এই প্রতিরোধের উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা করা, সমাজের দুর্বল লোকদের ওপর থেকে যুলুম প্রতিহত করা এবং মানুষকে তার আকীদা বিশ্বাস ও জীবন বিধান নির্বাচনের স্বাধীনতা প্রদান করা। রসূল (সা) ঐ সব আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ সর্বপ্রকারের শক্তি ও সহিংসংতার উপকরণ ব্যবহার করেন। তাদের কোন কোন আগ্রাসী কুচক্রী নেতাকে তাদের বাড়িতেই গোপনে হত্যা করে ফেলাও ছিল এই সব উপায় উপকরণের অন্যতম।

"যাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তারা নির্যাতিত ছিল। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। যাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে। তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে, তারা বলেছেন "আমাদের প্রভু আল্লাহ।" আর যদি আল্লাহ কতক মানুষকে দিয়ে কতক মানুষকে প্রতিহত না করতেন, তাদের সেই সব উপসানালয়সমূহ ও মসজিদ সমূহকে ধ্বংস করে ফেলা হতো, যেখানে আল্লাহর নাম বেশি বেশি স্মরণ করা হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। যাদেরকে আমি দেশে ক্ষমতাসীন করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, বস্তুত আল্লাহর হাতেই সব কিছুর শেষ ফল। (হজ্জ ঃ ৩৯-৪১)

"তোমাদের ওপর লড়াই ফরয করা হলো, অথচ সেটা তোমাদের অপছন্দ। হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করবে। অথচ সেটা তোমাদের জন্য ভালো। আবার হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে পছন্দ করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য খারাপ। বস্তুত আল্লাহই জানেন। তোমরা জাননা। তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ কেমন ? তুমি বল ঃ নিষিদ্ধ মাসে লড়াই করা একটা মারাত্মক ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে ফেরানো, তাকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারাম থেকে ফিরিয়ে রাখা, এবং সেখান থেকে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা আল্লাহর কাছে আরো মারাত্মক। আর যুলুম নির্যাতন করে ইসলাম থেকে জোরপূর্বক ফেরানো আরো মারাত্মক। তারা সম্ভব

www.pathagar.com

হলে তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে তোমাদের সাথে লড়াই করেই চলেছে। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্য বরণ করবে দুনিয়া ও আখেরাতে তার সমস্ত নেক আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ ধরনের লোকেরাই দোযখবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জেহাদ কাছে, তারা আল্লাহর রহমত আশা করে এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল, (আল-বাকারাহ ২ ঃ ২১৬-২১৮)

"আর তোমরা মোশরেকদের সাথে সবাই মিলে লড়াই কর। যেমন তারা তোমাদের সাথে সবাই মিলে লড়াই করে। জেনে রেখ, আল্লাহ সংযমীদের সাথে থাকেন।" (তওবা ঃ ৩৬)

"তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাদের বিরুদ্ধে। তবে সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। আর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে, সেখান থেকে তাদেরকেও বহিস্কার কর। আর মানুষকে নির্যাতন করে ধর্মচ্যুত করা হত্যার চেয়েও মারাত্মক। আর তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে মসজিদুল হারামে লড়াই না করে, ততক্ষণ তোমরাও সেখানে তাদের সাথে লড়াই করোনা। তারা যদি তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। কাফেরদের শাস্তি এ রকমই। অতপর তারা যদি লড়াই থেকে নিবৃত্ত হয়, তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যতক্ষণ ফেতনা (অত্যাচারের মাধ্যমে স্বাধীনতা হরণ) অবশিষ্ট না থাকে, এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে না যায়, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। অতপর তারা যুদ্ধ বিরত হলে অত্যাচারীরা ছাড়া আর কারো ওপর আক্রমণ চালানো যাবে না। নিষিদ্ধ মাসের (যুদ্ধের বিনিময়) বিনিময়ে নিষিদ্ধ মাস। আর প্রত্যেক নিষিদ্ধ জিনিস লংঘনের বিনিময়ে কিসাস তথা শাস্তি। যে ব্যক্তি তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করবে, তোমরাও তার ওপর অবিকল তার বাড়াবাড়ির সমান বাড়াবাড়ি করবে। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ সৎ লোকদের সাথে থাকেন। (আল-বাকারা-১৯০-১৯৪) "হে মুমীনগণ, তোমাদের কী হয়েছে যে,

www.pathagar.com

তোমাদেরকে যখন আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন মাটির সাথে লেগে যাও। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে গেপ্টে ? আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার সামগ্রী খুবই সামান্য। তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তবে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন, তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন জাতিকে আনবেন এবং তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তো সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" (তওবাঃ ৩৮-৩৯)

"যে জাতি তাদের শপথ ভংগ করেছে, রসূলকে বহিস্কার করতে উদ্যত হয়েছে, এবং তোমাদের সাথে প্রথম বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, তাদের সাথে কি তোমরা যুদ্ধ করবে না ? তেমরা কি তাদেরকে ভয় পাও ! আল্লাহই ভয় পাওয়ার অধিকতর যোগ্য, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের হাত দিয়ে শাস্তি দেবেন, অপমানিত করবেন, তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করবেন এবং মুমিনদের বক্ষকে রোগমুক্ত করবেন।" তওবা ঃ ১৩-১৪)

"হে মুমিনগণ! তোমাদের পাশ্ববর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর এবং তারা যেন তোমাদের ভেতরে কঠোরতা পায়। আর জেনে রেখ, আল্লাহ পরহেজগারদের সাথে থাকেন।" (তওবা ঃ ১২৩)

"তারা আল্লাহর জ্যোতিকে ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তার জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করতে বদ্ধপরিকর। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে অন্য সকল দ্বীনের ওপর তাকে বিজয়ী করে দেন–যদিও মোশরেকরা তা অপছন্দ করে। হে মুমিনগণ ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সম্মান দেবনা, যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে, তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনবে, এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা জানতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন, এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে, ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর প্রবেশ করাবেন চিরস্থায়ী জান্নাতের পবিত্র বাসস্থান সমূহে। এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। আরো একটা জিনিস যা তোমরা পছন্দ কর– তা

www.pathagar.com

হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মোমেনদেরকে সুসংবাদ দাও। (আশ্-সাফা ৮-১৩)

"সুতরাং যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, এবং তোমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দেয়, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি। তোমরা এ ছাড়া এমন কিছু লোকও পাবে যারা তোমাদের থেকে নিরাপদ থাকতে চায় এবং নিজেদের কওমের থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়। যখনই তাদের ফিতনার দিকে আকর্ষণ করা হয়, তখনই তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতএব তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে সরে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং নিজেদের হস্ত সংবরণ না করে, তবে তাদেরকে পাকড়াও করবে এবং যেখানেই তাদেরকে পাবে হত্যা করবে। আর আমি তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রমাণ প্রদান করেছি।" (আন-নিসা, ৯০-৯১)

"আর তারা যদি সন্ধির দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহলে তুমিও সেদিকে আকৃষ্ট হবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (আল-আনফাল, ৬১)

"যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় আচরন করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়চারীদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তো তোমাদেরকে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন কেবল ঐ সব লোকের সাথে, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করার ব্যাপারে সাহায্য কচ্ছে। যারা এদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাই তো হবে যথার্থ অন্যায়কারী।" (মুমতাহিনা ঃ ৮-৯)

তৃতীয়ত, আমরা দেখতে পাই, রসূল (সা) তাঁর নির্দেশাবলীতে ও তাঁর থেকে বর্ণিত ফেতনা সংক্রান্ত হাদীসগুলোতে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও সংঘর্ষের নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সহিংসতা প্রয়োগ ও সহিংসতার জবাবে সহিংসতা প্রয়োগকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আমরা যখন যুক্তির মাপকাঠিতে বিভিন্ন জিনিসের বিচার বিবেচনা করি, তখন আমাদের এটা ভেবে দেখা জরুরী হয়ে পড়ে যে, মুসলমানরা মক্কা থেকে হিজরত করার পর তাদের জন্য কোরায়েশ ও অনুরূপ

www.pathagar.com

অন্যান্য আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ও সহিংস অভিযান চালানোকে বৈধ করে দেয়ার পেছনে যুক্তি কী ছিল, যে জিনিস তাদের ওপর মক্কায় থাকাকালে নিষিদ্ধ ও হারাম ছিল সেই জিনিস মক্কা থেকে চলে যাওয়ার পর বৈধ হয়ে গেল কেন। কোরআন ও রসূল (সা) তাদের জন্য সহিংসতা প্রয়োগের শুধু অনুমতিই দেননি, বরং তার হুকুমও দিয়েছেন এবং তার জন্য উৎসাহিত করেছেন। বস্তুত এর পেছনে কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ ও মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত না থেকে পারে না। এটা উপলব্ধি করা খুবই জরুরী। নচেত ঐ দুটো নীতির একটা ভ্রান্ত সাব্যস্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় ব্যাপারটা সেই সব ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত হয়ে দাঁড়ায় না, যেখানে শরীয়াতের আদেশকে ভুলক্রমে মানসুখ বা রহিত মনে করা হয়। অর্থাৎ উক্ত হাদীস বা আয়াতের নির্দেশ তার পূর্ববর্তী নির্দেশকে বাতিল বলে ঘোষণা করেনা। বরং তা পরবর্তী একটা নতুন অবস্থার জন্য প্রযোজ্য নতুন নির্দেশ বলে গণ্য হয়। অন্য কথায় বলা যায়, দুটো অবস্থা ও দুটো নির্দেশ পরস্পরের পরিপূরক ও পরস্পরের সাথে সমন্বিত। প্রত্যেকটা অবস্থা ও প্রত্যেকটা নির্দেশ অন্য অবস্থা ও নিদেৃশ থেকে ভিন্নতর। কোরআনী আইনগুলোর ভেতরে এই বৈশিষ্ট্যই আমাদের চোখে পড়ে। কোরআনী আইনগুলো পরস্পরের পরিপূরক। এর কোনটা অপরটার বিরোধী বা বাতিলকারী নয়। কেননা কোরআনী আইনগুলো এমন আইন ও এমন মূলনীতি, যা সকল দেশের ও সকল যুগের মানব সমাজের ভিত্তিমূলের সাথে সংশ্লিষ্ট। এমন কোন মানব রচিত আইন নয়, যা একটা নির্দিষ্ট যুগের ও নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। এ কারণে মানবরচিত আইনের যে বিধিটি সেই নির্দিষ্ট স্থান বা কালের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, সেটি বাতিল, রহিত বা 'মানুসুখ" ও অপ্রযোজ্য বলে গণ্য হয়ে থাকে, এবং তা আইন রচনার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত অথচ দুঃখের বিষয় যে, বহুসংখ্যক মানুষ কোরআনী আইন সম্পর্কে এরূপ ধারণাই পোষণ করে থাকে। রসূল (সা) এর যুগের মানবগোষ্ঠী ও রসূল (সা) এর যুগের সরকারের সাথে কোরআনী আইন ও বিধানের সম্পর্ককে তারা স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে ভুল বুঝেছে। তারা মানবরচিত আইন ও কোরআনী আইনের মধ্যে পার্থক্য করেনি। তারা জানেনা যে, কোরআন নবুয়ত যুগে বিরাজমান পরিস্থিতি ও পরিবেশকে এবং স্থান ও কালকে অতিক্রম করতঃ এমন আইন রচনা করে, যা স্থান কাল নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির উপযুক্ত ও সমগ্র মানবজাতির ওপর প্রযোজ্য। এ আইন মানব-সমাজের পরিস্থিতি-পরিবেশ পরির্বতনের সাথে সাথে তাদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটায়॥ তাই সে প্রয়োজন একই স্থানের অধিবাসী মানবগোষ্ঠীগুলোর কালের পরিবর্তন জনিত হোক অথবা একই সময়ে বিদ্যমান মানব গোষ্ঠীগুলোর স্থানের পরিবর্তনজনিত হোক। সম্ভবত মানব রচিত আইন ও কোরআনী আইনকে এভাবে একাকার করে ফেলার কারণেই ইসলামী আইন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নিস্প্রয়োজন

www.pathagar.com

খুঁটিনাটি বিধি প্রণয়নের প্রবণতা আজও অব্যাহত রয়েছে, এবং স্থান ও কালের বিপুল দূরত্ব ও ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার দরুন সর্বতোভাবে পরিবর্তিত আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট মানব সমাজগুলোর প্রয়োজনও তা মেটাতে পারছে না। এছাড়া মানব সমাজের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে আলেম সমাজের বিচ্ছিন্নতার কারণে চিন্তার ক্ষেত্রে এমন স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছে, যাকে ইজতিহাদের দরজার তালাবদ্ধতা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, সমাজে অন্ধ অনুকরণের ধারণা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

প্রসংগত এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে রাখা ভাল। সেটা এই যে, রসূল (সা) মদিনায় পৌঁছার পর এবং সেখানে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর কোরায়েশ ও মোশরেকদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহে তিনি যে সব সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করেছেন, তা থেকে বুঝা যায়, তিনি মক্কায় অবস্থানকালেই এ সব সাজ সরঞ্জামের সাথে পরিচিত ছিলেন। তাই এ সব সাজ সরঞ্জামের ব্যবহার থেকে তিনি অজ্ঞতা বা শত্রুদেরকে ঘায়েল করার কৌশল সহ অন্যান্য কাজে অক্ষমতার দরুণ বিরত থাকেননি। বরঞ্চ এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি এ সব কৌশলের আশ্রয় নেননি ইচ্ছাকৃতভাবেই এবং একটা মহৎ উদ্দেশ্যে। সে সময়ে মুসলমানদের ওপর যে নিষ্ঠুর নির্যাতন চলছিল, এবং তাদের ভেতরে ঈমানের যে দৃঢ়তা ছিল, তাতে আবু জাহল ও আবু সুফিয়ানের ন্যায় শীর্ষস্থানীয় কাফের নেতাদেরকে গোপনে বা প্রকাশ্যে খতম করে দিতে পারে-এমন দুঃসাহসী মুসলমানের অভাব তাঁর ছিলনা।

এখানে যে প্রশ্ন জাগে, তা হচ্ছে ঃ মক্কায় বসে কোরায়েশের অত্যাচারের জবাব দেয়া থেকে রসূল (সা) কেন বিরত থাকলেন ? কী ছিল তার উদ্দেশ্য ? আর কেনই বা তিনি মদিনায় হিজরত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদেরকে কোরায়েশের অত্যাচার, নির্যাতন ও লড়াই এর জবাব দেয়ার অনুমতি দিলেন ? পুনরায়, মদিনায় গোলযোগ ও রাজনৈতিক ও সংঘাত চলাকালে মুসলমানদেরকে কেন তিনি সহিংসতার জবাবে পাল্টা সহিংসতা, থেকে নিবৃত্ত থাকার আদেশ দিলেন ?

মক্কী যুগে কোরআন ও নবুয়তের শিক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুসলমানদেরকে কোরায়েশ নেতাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রয়োগ না করা ও কোরায়েশের পক্ষ থেকে যুলুম নির্যাতন হওয়া সত্ত্বেও তার জবাবে পাল্টা সহিংসতা না করার নির্দেশ দান ইসলামের বাধ্যতামূলক নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল। তখন মুসলমানরা যে সামাজে বাস করতো, সে সমাজের অভ্যন্তরে দাওয়াত ও সমাজপরিবর্তনের কাজ চালানোর প্রয়োজনেই এই নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল। রাজনৈতিক সংঘাত দমনে এটা কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল না। মক্কায় ও মদিনায় কোরআন ও রসূল (সা) এর যে শিক্ষা ও নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল,

www.pathagar.com

তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার জন্য মক্কায় সংঘাতের মূল প্রকৃতিই যথেষ্ট সহায়ক। মক্কার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল প্রকৃতি ছিল এ রকম যে, তা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মক্কী রাজনৈতিক নেতারা এর মাধ্যমে ইসলামী সংস্কার আন্দোলনকে গায়ের জোরে খতম করে দিতে চেয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে কোরআন ও রসূল (সা) এর সিদ্ধান্ত ছিল নীতিগত সিদ্ধান্ত। এতে কোন আপোষের অবকাশ ছিলনা। এ নীতির উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদের প্রকাশ্য দাওয়াত দেয়া, এবং মক্কায় কোরেশদের ইসলাম বিরোধী আক্রমণাত্মক নীতির শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ। নির্যাতনের জবাবে ধৈর্য অবলম্বন এবং বাড়াবাড়িকারীদের জবাবে কোন সহিংস পদক্ষেপ গ্রহণ না করাই ছিল এই প্রতিরোধের কর্মপদ্ধতি।

সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা একটা পর্যায়ক্রমিক কাজ। এর কিছু অংশ সম্পন্ন হয় ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংস্কার ও সংশোধনের মাধ্যমে। অন্য কিছু অংশ সম্পন্ন হয় সার্বজনীন ও রাজনৈতিক পর্যায়ে ব্যাক্তিগত সংস্কারের পর্যায়ে। যেটুকু সম্পন্ন হয়, সেটুকু চালু রাখা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। এই পর্যায়ে যে কাজ সমাধা করা হয়, তা হচ্ছে প্রধানত সদুপদেশ দান, সাহায্য সহযোগিতা করা, এবাদাত সমূহ সম্পন্ন করা, কল্যাণমূলক কাজ করা। মহৎ চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি উৎসাহ প্রদান, অভাবগ্রস্ত ও দুর্বলকে সাহায্য করা, এবং সাধ্যমত অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ। পক্ষান্তরে জাতীয় ও রাজনৈতিক পর্যায়ে যে কাজ সমাধা করা হয়, তা হচ্ছে বাক স্বাধীনতার প্রয়োগ। সদুপদেশ দান এবং সত্যের স্বপক্ষে সোচ্চার থাকা। এ কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে অহিংস পন্থায়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে, সভ্য জনোচিত পন্থায় ও রাজনৈতিকভাবে। ইমাম মুসলিম, আহমাদ ও অনান্য হাদীস বেত্তাগণ বর্ণিত এ হাদিসটিতে এই বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছে। রসূল (সা) বলেছেন ঃ "সর্বোত্তম জেহাদ হচ্ছে জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।" রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে, এমনকি তা যদি সৎ কাজের আদশ দান ও অসৎ কাজের প্রতিরোধের নামেও করা হয়, তবুও সহিংস পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষমতা ব্যক্তিবর্গ বা দলগুলোর হাতে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না, বরং তা হতে হবে সমগ্র সমাজের তথা জাতির পরামর্শ সভার সিদ্ধান্তক্রমে। আর যখন এক্ষেত্রে কোন একটা দল বা গোষ্ঠী সহিংসতার আশ্রয় নিয়ে বসে, তখন বিষয়টি দেশের পরামর্শ পরিষদ (তথা আইন সভা) এর কাছে পেশ করতে হবে। তখন সেই পরামর্শ পরিষদ এবং তাদের পেছনে অবস্থানকারী সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের জনতার উপরই বর্তাবে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দায়িত্ব, যাতে তাদের যুলুম ও বাড়াবাড়ি প্রতিহত করা যায়। আর যে গোষ্ঠীর ওপর যুলুম ও

www.pathagar.com

বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে॥ যতক্ষণ না অত্যাচারকারীর অত্যাচার সকলের চোখে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং জাতি সম্মিলিত ও সামষ্টিকভাবে তার ঐক্যবদ্ধ নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে তাদের আক্রমণাত্মক ও সহিংস কর্মকান্ডকে প্রতিহত বা সীমিত করতে পারে। সেই জনগোষ্ঠী মক্কার হোক, মদিনার হোক অথবা অন্য কোন দেশের হোক॥তাতে কিছু এসে যায় না। কেননা মযলুম ও নির্যাতিত ব্যাক্তির ধৈর্য, বিশেষত সে যদি সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়, তবে তা শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতিকে, তার নেতৃবৃন্দকে ও আইন সভাকে আন্দোলিত ও সক্রিয় করে তোলে, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বানায় এবং পরিস্থিতির দাবি মোতাবেক অত্যাচার, বাড়াবাড়ি ও সহিংসতাকারীকে প্রতিহত করার প্রেরণা যোগায়।

এভাবে সংস্কার ও সংশোধনের দাওয়াত যদিও সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ প্রতিরোধের আওতাভুক্ত, কিন্তু এ দ্বারা এ কথা বুঝায় না যে, বিরোধিতা মাত্রই একই প্রকৃতির ও একই চরিত্রের অধিকারী। কাজেই ব্যাক্তিবর্গ বা দল-গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে বেআইনীভাবে শাসক হয়ে চেপে বসা অন্যায় ও অবৈধ। এ পদ্ধতিতে তারা সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতিকে টুকরো টুকরো করা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধের নামে জাতিকে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিপ্ত করা ছাড়া আর কিছু করতে পারবেনা। এভাবে দেশ ও জাতির উপকারের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি। এভাবে সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে যে কাজ রাজনীতির অঙ্গনে করা হয়, তা রাজনৈতিক পদ্ধতিতেই করা হয় এবং তার সাথে জড়িত সকল পক্ষের সাথে পরামর্শসভা ও তার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকেই আচরণ করা হয়। এ অঙ্গনের সকল সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক ভাবেই করা হয়, এবং সহিংসতার মাধ্যমে কোন কাজ করারই অনুমতি দেওয়া হয় না। এ অঙ্গনে সহিংস পন্থায় কিছু করার অধিকার যদি থেকে থাকে, তবে তা শুধুমাত্র গোটা জাতির, জননেতৃবৃন্দের ও জাতীয় পরার্মশ পরিষদ॥তথা সংসদের আইন সঙ্গত অধিকার। সহিংসতা জনগণের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালানোর হাতিয়ারও নয়। দলগুলোর মধ্যকার বিতর্কিত বিষয় একতরফাভাবে নিষ্পত্তির মাধ্যমে দল বিশেষের প্রাধান্য অর্জনের উপকরণও নয়।

এ বিষয়ে কোরআনের কয়েকটি আয়াত লক্ষ্য করুন ঃ

"হে আমার ছেলে, তুমি নামায কায়েম কর," সৎ কাজের আদশে দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর, তোমার ওপর যে সব বিপদ মুসিবত আসে, তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এগুলো দৃঢ় সংকল্পের কাজ, (সূরা লুকমান ঃ ১৭)

www.pathagar.com

"তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান, রাখবে। কিতাবধারীরা যদি ঈমান আনতো, তা হলে সেটা তাদের জন্য উত্তম হতো। তাদের মধ্যে কতক আছে মুমিন। তবে বেশির ভাগই ফাসেক।" (আল-ইমরান ঃ ৩১০)

"তোমাদের মধ্যে থেকে একটা দল এমন গঠিত হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। বস্তুত তারাই সফলকাম। (আল-ইমরান ঃ ১০৪)

"যারা সেই নিরক্ষর নবীর অনুসরণ করে, যাঁর বিবরণ তারা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজে আদেশ দেন, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করেন, অপবিত্র জিনিসগুলোকে তাদের ওপর হারাম করেন এবং তাদের ওপর থেকে সেই সব কড়াকড়ি ও গুরুভার অপসারিত করেন যা তাদের ওপর চাপানো ছিল। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং তার সাথে অবতীর্ণ আলোর অনুসরণ করেছে। তারাই সফলকাম।" (আরাফ ঃ ১৫ ম)

"মোনাফেক পুরুষরা ও মোনাফেক নারীরা পরপুরুষের দলভুক্ত। তারা খারাপ কাজের আদেশ দেয় ও ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে এবং নিজেদের হাত (দান করা থেকে) গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মোনাফেকরাই ফাসেক।" (তাওবা ঃ ৬৭)

"তারা নিজেদের কৃত অপকর্ম থেকে পরস্পরকে নিষেধ করতোনা। এটা ছিল তাদের অতীব জঘন্য কাজ।" (আল মায়েদা, ৭৯)

অনুরূপ আমরা যদি ফেতনা সংক্রান্ত সেই হাদীসগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেই, যেগুলোতে রসূল (সা) তাঁর ইন্তেকালের পর বিশেষভাবে মদিনায় যে সব রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও গোলযোগপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটবে, সে সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন প্রশ্নের জবা দিয়েছেন, তাহলে আমরা সে সব বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন জবাব দেখতে পাই। তিনি তার সেই সব জবাবে মক্কায় অনুসৃত

www.pathagar.com

ইসলামের এই মূলনীতি বিশ্লেষণ করে যে, একটা একক ও অখন্ড সমাজে যেখানে মুসলমানরা ও অমুসলমানরা এক সাথে মিলে মিশে বসবাস করছে সেখানে পারস্পরিক রাজনৈতিক সংঘাতের মীমাংসায় শক্তি ও সহিংসতা প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। এমনকি, সে সমাজের কোন কোন গোষ্ঠী বা দল যদি যুলুম প্রতিরোধ ও সংস্কারের আহ্বান জানাতে গিয়ে আরো অত্যাচার ও নির্যাতনের কবলে পড়ে, তা হলেও সহিংসতা ও শক্তি প্রয়োগ করা চলবে না। বরঞ্চ সকল পক্ষের কর্তব্য শান্তিপূর্ণ উপায় ও পরামর্শের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করা। নির্যাতিতদেরও উচিত আগ্রাসী ও অত্যাচারী গোষ্ঠীর যুলুম নিপীড়নমূলক কর্মকান্ডকে জাতি, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জাতীয় সংসদের হাতে সমর্পণ করে তাদেরকে তাদের সামাজিক ও সামষ্টিক দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দেয়া। জাতি, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জাতীয় সংসদের কর্তব্য হলো, তারা যেন দল ও গোষ্ঠী সমূহের পারস্পরিক সংঘাতকে॥ যা সমাজকে লন্ডভন্ড ও ছিন্নভিন্ন করে দেয়॥ অব্যাহত থাকতে না দেন। তাদের উচিত আগ্রাসী গোষ্ঠীর আগ্রাসনকে॥ দেয়া চাই তার প্রতি সমর্থন জানানো থেকে নিবৃত্ত থাকার মাধ্যমেই হোক, অথবা সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে উপযুক্ত পন্থায় শক্তি প্রয়োগ করে থামিয়ে দেয়ার মাধ্যমেই হোক-যখন শক্তি প্রয়োগ করা একেবারেই অনিবার্য হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক বিরোধ নিরসনে সহিংসতা বর্জন ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় বরং নীতিগত ব্যাপার

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মক্কার জীবনে রসূল (সা) এর অনুসৃত নীতি এবং মদিনার জীবনেও মাদানী সমাজের অভ্যন্তরে উদ্ভূত রাজনৈতিক বিরোধও সংঘাত নিরসনের সহিংসতা প্রয়োগে তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, ইসলাম রাজনৈতিক বিরোধ ও সংঘর্ষকে সর্বব্যাপী রাজনৈতিক গোলযোগ ও বিপর্যয়ে রূপান্তরিত হতে ও এতটা মারাত্মক আকার ধারণ করতে দেয়না, যাতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক তার সমাধান ও মীমাংসা করা বা তাকে প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসলামের এই স্পষ্ট দৃষ্টিভংগী মক্কা ও মদিনা উভয় জায়গায় সমগ্র নবী জীবন ব্যাপী তাঁর অনুসৃত নীতি ও প্রতিফলিত করে। এ নীতি ও আদর্শ থেকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সর্বজনীন সর্বব্যপী রাজনৈতিক মূলনীতি উদ্ভাবন করতে পারি। সে মূলনীতি হলোঃ একটা অখন্ড ও একক সমাজে কোন রাজনৈতিক বিরোধের উদ্ভব ঘটলে অবশ্যই তার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে। আগ্রাসী রাষ্ট্রদ্রোহীকে তার রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ড বর্জনে বাধ্য করতে হবে, জাতির বিচক্ষণ নেতৃবৃন্দ ও জাতীয় সংসদ সহ সমগ্র জাতির কর্তব্য উগ্রতা ও সহিংসতার উৎস যেখানেই থাক না কেন, তা এবং আগ্রাসী পক্ষের হাতকে থামানো চাই তা অসহযোগিতার মাধ্যমেই হোক অথবা তাকে তার আগ্রাসন বন্ধ করতে বাধ্য করার জন্য শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই হোক।

সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনাবলী যদি বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটে এবং সরকার তার সাথে জড়িত না থাকে, তাহলে সরকার এই আগ্রাসন ও বাড়াবাড়ি প্রতিহত ও প্রতিরোধ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেননা এটা সরকারেরই দায়িত্ব। কিন্তু যদি সরকারী পক্ষের লোকেরাই অত্যচার ও বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তা বন্ধ করার দায়িত্ব সমগ্র জাতির ঘাড়ে ন্যস্ত হয়। বাড়াবাড়ি ও

www.pathagar.com

অত্যাচার বন্ধ করা প্রত্যেক জাতির নেতৃবৃন্দেরও কর্তব্য। সমাজের অস্থিরতা ও বিকৃতি দূর করা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সমাজের সকলের ব্যক্তিগত ও সামজিক কর্তব্য। সর্বাধিক শোভনীয় পন্থায় একাত্মর্তা প্রতিষ্ঠা ও বাড়াবাড়ি দূর করার লক্ষ্যেই এটা সকলের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করলে জাতি ও তার নেতৃবৃন্দ তার জন্য জবাবদিহী করতে বাধ্য হবে। বিদ্রোহীদের যুলুম প্রতিহত করা চূড়ান্ত পর্যায়ে গোটা জাতি ও তার সংসদের কর্তব্য। মজলুম ও নির্যাতিত সংস্কারকদের ওপর এ দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। কেননা তাহলে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একই সাথে প্রতিপক্ষ, শালিশ ও শাসক সবই হয়ে বসবে এবং যুলুম ও বাড়াবাড়ি জনিত অপরাধের জবাবে সর্বব্যাপী যোগাযোগ ও অরাজকতা জড়িয়ে পড়বে। বস্তুত স্থিরতা ও স্থিতিশীলতা গোলযোগের মাধ্যমে নয়, বরং জাতির ঐক্য ও পরামর্শের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় এ প্রসংগেই আবু দাউদে এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যখন লোকেরা একজন যুলুমবাজকে দেখেও তার যুলুমবাজী বন্ধ করে না আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাদের সকলকেই শাস্তি দেবেন।"

ভালো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো আকস্মিক রাজনৈতিক গোলযোগ ও জরুরী অবস্থাকে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করার জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক ও আইনগত ব্যবস্থা প্রয়োগ করে থাকে। তাই এ কাজে তাদের সহিংসতা বলপ্রয়োগ ও গণবিপ্লবের আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন হয় না। যা যুলুম প্রতিরোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্ত শান্তিপূর্ণ পথ বন্ধ করে দেয়।

বস্তুত একটি সভ্য জাতির পক্ষে এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে সংস্কারবাদী, শান্তিপ্রিয় ও ধৈর্যশীল একটা গোষ্ঠীর ওপর ক্রমাগত অত্যাচার, নিপীড়ন ও সহিংসতা প্রয়োগ নীরবে দেখতে থাকবে, তাই সে অত্যাচারী ও নিপীড়নকারী যেই হোক না কেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যে মনস্তাত্বিক উপকরণগুলো কার্যকর থাকে, তা সুস্পষ্ট। আর এই উপকরণগুলো থেকে তৈরি ফলাফল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সমূহ একাধিক।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

> "মোমেনদের দুটো দল যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। এরপর যদি তাদের একটা অপরটার ওপর আক্রমণ করে, তাহলে আক্রমণকারী দলটার বিরুদ্ধে লড়াই কর, যতক্ষণ না সে আল্লাহর আদেশের কাছে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তাহলে উভয়ের মধ্যে ন্যায়বিচার ভিত্তিক আপোষ মীমাংসা করিয়ে দাও এবং

www.pathagar.com

ন্যায়বিচার কর। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদেরকে ভালো বাসেন। মোমেনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের দুই ভাই এর মধ্যে আপোষ করিয়ে দাও। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমরা কৃপা লাভ করবে।" (আল- হুজুরাত আয়াত ঃ ৯ ও ১০)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজের প্রতি সদয় আচরণই সমাজের ন্যায়বিচার ও উদারতা প্রতিষ্ঠার উপায়

এখানে পুনরায় জোর দিয়ে এ কথাটা বলা দরকার যে, মজলুম ও নিপীড়িত ব্যক্তি যখন এতটা ধৈর্যের পরিচয় দেয় যে, অত্যাচার ও সহিংসতার জবাব অত্যাচার ও সহিংসতা দিয়ে দেয় না, তখন সমগ্র জাতি ও তার নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা একটা সঠিক ও নির্ভুল নীতি এমনকি যুলুমকারী যদি স্বয়ং শাসক হয় তবুও। কাজেই যারা সমাজ সংস্কারের কাজে লিপ্ত, তারা দয়া ও ক্ষমার প্রতীক বিবেচিত হন বিধায় তাদের পক্ষ থেকে যদি সহিংসতার জবাব সহিংসতা দ্বারা দেয়া না হয়, তাহলে এই প্রতিশোধ গ্রহণের দায়িত্বটা অবশ্যই সমগ্র জাতির ঘাড়ে ন্যস্ত হবে। যদি জাতি, জাতীয়, নেতৃবৃন্দ ও জাতির উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতাদের বিবেকে সংস্কারক ও মজলুমদের সাহায্য এবং তাদের অধিকার ও দুর্বলতার প্রতি সচেতনতা সহানুভূতির লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে, এবং যদি অত্যাচারী শাসকে তার জুলুম, নির্যাতন ও বিপথগামীতা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অথবা তার পতন ঘটানোর মাধ্যমে তার যুলুম ও নির্যাতনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে তার প্রতি অসহযোগিতা প্রদর্শনের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা থেকে থাকে, তাহলে তাদেরকে এই প্রতিশোধ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ জাতি হচ্ছে তার সন্তানদের আত্মীয়স্বজন। সুতরাং যে মহান আল্লাহ যুলুমকে নিজের ওপরও হারাম করছেন এবং মানব জাতির ওপরও হারাম করেছেন সেই আল্লাহর আদেশ অমান্য করে কোন সৃষ্টির আদেশ মান্য করা যায় না। আর জাতির স্থিতি ও নিরাপত্তা ধ্বংসকারী মারাত্মক ভুল কাজ হলো, একটা দলের সাথে যখন আর একটা দলের সংঘর্ষ হয় এবং প্রত্যেক পক্ষ তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সহিংসতার আশ্রয় নেয়, তখন সমগ্র জাতি কারো পক্ষ নিয়ে নীরব দর্শক সেজে বসে থাকে এবং এই সংঘর্ষের শেষ ফল কী দাঁড়ায়, তা দেখার অপেক্ষায় থাকে। অথচ এ ধরনের সংঘর্ষের ফলে সকল পক্ষের শক্তি ক্ষয় হওয়া, সমগ্র জাতির স্থিতি ধ্বংস হওয়া ও

www.pathagar.com

তার অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু অর্জিত হয় না। সুতরং সামগ্রিকভাবে জাতিকে সক্রিয় করার কোন উপায় যদি থেকে থাকে, তবে সে উপায় হলো জননেতাবৃন্দের পক্ষ থেকে অত্যাচারী ও সীমা অতিক্রমকারীকে চিহ্নিত করা ও তার বাড়াবাড়ির নিন্দা করা। একমাত্র এভাবেই তার বাড়াবাড়ি ও অত্যচার বন্ধ করা যেতে পারে। বরঞ্চ মনে হয়, জাতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বাড়াবাড়ি ও অত্যাচারের শেষ সময় বেধে দেয়া, বাড়াবাড়ির ভয়াবহতা সংস্কারের দাওয়াতে আন্তরিকতা এবং মজলুমের অধিকারের আইনানুগতা, জাতির ও জননেতৃবৃন্দের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য এবং অত্যাচারী ও সীমা অতিক্রমকারীদের বিরুদ্ধে একাত্মতা ও ঐক্য সৃষ্টির জন্য জরুরী পূর্বশর্ত। সুতরাং ত্যাগ তিতীক্ষা ও শান্তিপূর্ণ উপায় উপকরণ প্রয়োগের ওপর ধৈর্য ধারণ করা ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই হবে সংস্কারমূলক পরিবর্তন, আগ্রাসন ও অত্যাচারের প্রতিরোধ এবং অব্যাহত গোলযোগ, উত্তেজনা, অস্থিরতা ও সহিংসতা বন্ধ করার একমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়।

এভাবে যখন কোন সংস্কারবাদী দল তার সংস্কারের দাওয়াত প্রকাশ্য ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে অব্যাহত রাখতে চায় এবং অপর একটি দল, চাই তা শাসক দলই হোক না কেন, অত্যাচার, নির্যাতন, আগ্রাসন, সীমা অতিক্রম, স্বৈরাচার ও দমনমূলক কর্মকাণ্ড চালিযে যেতে চায়, তখন জাতির প্রতি যারা যথার্থ সহানুভূতিশীল, তাদের গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা অপরিহার্য। সীমা অতিক্রমকারীকে তার বাড়াবাড়ি ও উগ্র আচরণ অব্যাহত রাখতে দেয়া অনুচিত। জনগণের উচিত তার সমর্থন ও সহযোগিতা থেকে সরে আসা, তাকে সংশোধনের যেটুকু উপায়-উপকরণ অবশিষ্ট থাকে তা গ্রহণ করে সংশোধনের চেষ্টা চালানো। তাকে তার অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড তেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা, অথবা সর্বশেষে জনগণকে সাথে নিয়ে তার সমস্ত শক্তির উৎস নির্মূল করা। এ কারণেই কোরআন জনগণকে সম্বোধন করছে না। সমাজ থেকে জুলুম ও আগ্রাসন উচ্ছেদ করার দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে জনগণের ওপর অর্পণ করেছে জুলুম ও আগ্রাসনের ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়টি সংঘর্ষে লিপ্ত পক্ষগুলোর ওপর ছেড়ে দেয়নি।

এখানে এ বিষয়টি উল্লেখের প্রয়োজন নেই যে, এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করলাম, তা নির্বাচিত ও জনগণের পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত শাসকগণ কর্তৃক অপরাধ উচ্ছেদ ও অপরাধী দমনের লক্ষ্যে আইনানুগ শক্তিপ্রয়োগ থেকে ভিন্ন ব্যাপার। কেননা শাসক সুলভ দায়িত্ব পালন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সংস্কার এবং জনগণের শান্তি, অধিকার ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইনানুগ শক্তি প্রয়োগ করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্যই জনগণ তাদেরকে নির্বাচিত করেছে ও তাদের হাতে এর ক্ষমতা

www.pathagar.com

অর্পন করেছে। তাই এ কাজ তার শাসকসুলভ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বেরই দাবি। এটা যুলুম নিপীড়ন, অরাজকতা ও অনধিকার চর্চার পর্যায়ে পড়ে না।

তবে যখন নির্যাতিত ও মজলুম জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল উল্লেখযোগ্য কোন জনশক্তি ও জনমত সমাজে অবশিষ্ট থাকেনা, অথবা তাদের ওপর হামলা হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যাগুরু জনগণের পক্ষে থেকে তাদের দাবি অস্বীকার করা, এবং অধিকার গ্রাস করা ও হরণ করার প্রতি সমর্থন দানের প্রতীক, তখন সেখানে স্বভাবতই হিজরত ও দেশত্যাগের প্রশ্নটা এসে পড়ে। কেননা একটি দুর্বল নিপীড়িত জনগোষ্ঠী, যার কোন অধিকারের স্বীকৃতি নেই এবং যার প্রতি সহানুভূতিশীল কোন জনশক্তি নেই, তার পক্ষে সে ক্ষেত্রে সহিংস পন্থায় কোন প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করাও যেমন ভ্রান্তই থেকে যায় তেমনি সেখানে ধৈর্য ধারণ করে মাটি কামড়ে পড়ে থেকেও কোন লাভ হয় না। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যতীত এবং তাও হয়তো দীর্ঘকাল পরে। সে ক্ষেত্রে এমন কিছু অজানা মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ ও অভাবিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে, যার ধরণ ও প্রকৃতি তাৎক্ষনিকভাবে চোখেও দেখা যায় না এবং কল্পনায়ও আসেনা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

শান্তিপূর্ণ দাওয়াত ও প্রতিরোধ আন্দোলন সমূহের ইতিহাস থেকে কিছু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত

এ পর্যন্ত আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম, তা ছিল তাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক পর্যায়ের। এখান থেকে আমরা যদি বাস্তব পর্যায়ে চলে যাই এবং বৃহত্তম সংস্কারমূলক দাওয়াত ও আন্দোলনগুলোর অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি দেই, তাহলে অতীত ও বর্তমানের সেই সফল আন্দোলনগুলোতে আমরা এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, যা আমার এই বক্তব্যকে বাস্তব আকারে সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেয়।

খৃষ্টধর্মের আহ্বায়করা রোমক স্বৈরাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচারাভিযানে নেমেছিলেন এবং সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় এই আন্দোলন অব্যাহত রেখে ছিলেন। অপরদিকে রোমক শাসকরা তাদেরকে সহিংস ও উৎপীড়নমূলক পন্থায় প্রতিহত করতে থাকে এবং নির্যাতন ও নিপীড়নের ষ্টীমরোলার চালাতে থাকে। কিন্তু এই সংস্কারপন্থী আহ্বায়ক ও প্রচারকগণ ধৈর্য ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে তার মোকাবিলা করতে থাকেন। এই যুলুম ও অত্যাচার প্রতিরোধে তারা সহিংস পন্থার আশ্রয় নিতে সর্বতোভাবে বিরত থাকেন। পৌত্তলিক ও পাপাচারী রোমক শাসকদের মোকাবিলায় এটা ছিল তাদের নীতিগত অপরিহার্য অবস্থান। নিজেদের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত ও রাজনৈতিক অবস্থান ছিল না। এ কারণেই সংস্কারমূলক দাওয়াতী অভিযানের সামনে সেই রোমক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এবং তার টিকে থাকার সহায়ক সমস্ত শক্তি ধ্বংস হতে বাধ্য হয়েছিল। যার ফলে তার সমস্ত জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সংস্কারবাদী খৃষ্টীয় আন্দোলন বিজয়ী হয়েছিল। পরিণামে সেই সুমহান মানবীয় অভিজ্ঞতা জনগণের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছে এবং ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পাই, সহিংসতার জবাব সহিংসতার মাধ্যমে না দেয়ার একই নীতি অবলম্বন করে রসূল (সা) মক্কায় নিজের বংশীয় পরিমন্ডলে

www.pathagar.com

তথাকার কর্তৃত্বশীল মহলের দুর্নীতি, স্বৈরাচার, যুলুম নিপীড়ন ও আকীদাগত বিকৃতির বিরুদ্ধে ইসলামী সংস্কার ও সংশোধনের প্রকাশ্য প্রচারাভিযান অব্যাহত রাখেন। আর জানমালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও ভয়ংকর যুলুমনিপীড়ন সয়েও রসূলের (সা) ঐ অহিংস নীতির কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার নেতাদের অত্যাচারের ভয়াবহতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। তাছাড়া বনু হাশেম ও মক্কার আরো কিছু নেতৃস্থানীয় গোত্র তাদেরকে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় তাদের উক্ত নীতি, আদর্শ ও আচরণ মক্কীয় সমাজের সর্বোত্তম শক্তিমান পুরুষদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজনকে ইসলামী আন্দোলনের কাতারে শামিল করে দেয়। এর ফলে মক্কার কর্তৃত্বশীল মহলে বিশৃংখলা ও ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং তার নৈতিক দুর্গ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আর পরবর্তী কালে যখন আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য মদিনার বিজয় ও হিজরতের আবাসভূমি সংগ্রহ করে দেন, তখন মক্কার এই কর্তৃত্বশীল মহলের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সমকালীন ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, ইরানের শাহ বিরোধী ইসলামী আন্দোলন, শাহী-শাসনের দুর্নীতি ও বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং শান্তিপূর্ণ বেসামরিক উপায় উপকরণে মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। তার ঐ শান্তিপূর্ণ নীতিই আন্দোলনের বিজয় ও শাহী সরকারের পতন আসন্ন করে তোলে। কারণ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ইরানী বাহিনীর স্বজাতীয় লোক ছিল বিধায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সংঘবদ্ধ দলগুলোর বিরদ্ধে ইরানি বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে সৈন্যরা সরকারের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে হাতিয়ারে পরিণত হয় এবং নিরীহ ও নিরস্ত্র নারী ও পুরুষদেরকে দলে দলে হত্যা করতে থাকে। কিন্তু সরকারের রক্ষক এই বাহিনী, যা কিনা ইরানী জনগণেরও স্বজাতীয় ছিল, শেষ পর্যন্ত সরকারের আদেশ অমান্য করতে বাধ্য হয় এবং হত্যা ও রক্তপাত অব্যাহত রাখতে অসম্মত হয়। এভাবে সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার সাথে সাথেই সরকারের পতন ঘটে এবং প্রতিরোধ ও পরিবর্তনকামী আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয়। যারা মনে করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক শাহী সরকারের সমর্থন প্রত্যাহারে দরুনই শাহের পতন ঘটেছিল, তারা ভুল করেছে। আসলে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলনের আকস্মিক আবির্ভাবই শাহী সরকারের পতন ও ইরানী জাতীয় প্রতিরোধের বিজয়ের প্রকৃত কারণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক মুহূর্তের জন্যও শাহী সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেনি। বরঞ্চ শাহী সরকার ও তার সেনাবাহিনীই ইরানী জনগণের অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে। এটা ছিল এমন একটা শিক্ষা যা নিয়ে মুসলিম চিন্তাবিদদের ও মুসলিম জাতিগুলোর গভীর চিন্তাভাবনা করা উচিত।

www.pathagar.com

অপর দিকে, এই একই বিশ্লেষণ অনুসারে, ইরানী বিপ্লবী সরকার যেদিন সাদা কাফন পরিয়ে হাজার হাজার নিরস্ত্র ইরানীকে ইরাকী বাহিনী ও তার সামরিক ঘাঁটিগুলো অভিমুখে পাঠিয়েছিল, সেদিন সম্ভবত ভুল করেছিল। ইরকী বাহিনী দল ঐ সব নিরস্ত্র লোককে আক্রমণ করে খতম করে ফেলতে মোটেই দ্বিধা করেনি। এ পদক্ষেপ ছিল এ জন্য যে, এখানকার প্রেক্ষাপট ইরানের অভ্যন্তরে সরকার ও সরকার বিরোধীদের মধ্যে সংঘঠিত মুখোমুখি সংঘাতের প্রেক্ষাপট থেকে স ম্পূর্ণ ভিন্ন। যেহেতু এখানে যে সংঘর্ষ চলছিল তা ছিল দুটো আলাদা সমাজ, আলাদা দেশ ও আলাদা সরকারের মধ্যকার সংঘর্ষ। দেশ দুটোর একটা ছিল ইরানী ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং অপরটি ইরাকের জাতীয়তাবাদী প্রজাতন্ত্র। উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কের অভ্যন্তরে প্রত্যেক দেশের ভেতরকার স্বজাতিভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রচ্ছন্নভাবে কার্যকর থাকে। কিন্তু পরস্পর বিরোধী এই দুটো দেশের রাজনৈতিক সীমারেখার দুই প্রান্তে শাসন ক্ষমতা দল ও গোষ্ঠীসমূহের মাঝে বিরাজ করত সংঘাতময় সম্পর্ক। তাই ইরানের শাহের সরকারের অধীনে স্বজাতীয় ইরানী সামজের অভ্যন্তরে ইরানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োগকৃত এই সব অসামরিক পদক্ষেপ যে সুফল বয়ে এনেছিল, অবিকল সেই সুফল ইরাক-ইরান যুদ্ধের পরিমন্ডলে বয়ে আনতে পারেনি।

সমকালীন তুরস্কে ইসলামী সংস্কারবাদী আন্দোলনও পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটিও এমন একটি ইসলামী আন্দোলন, যা বেসামরিক ও শান্তিপূর্ণ পন্থার মধ্যে নিজেদের তৎপরতাকে সীমিত রেখেছে অথচ তা সংস্কারমূলক দাওয়াত থেকে সরে আসেনি। এ আন্দোলনের নেতকর্মীরা নিজেরাও সহিংসতার আশ্রয় নেয়নি, তাদের অনুসারীদেরকেও সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহিংসতার আশ্রয় নিতে দেয়নি। অথচ শাসক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাদেরকে অনেক চাপ, অনেক বাধাবিপত্তি ও অনেক দুঃখ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। এভাবে অহিংস নীতি আকড়ে থাকার ফলে সেখানকার ইসলামী আন্দোলনের প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের মত বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন কর্তৃক ইদানিং অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে রাজনৈতিক লড়াইতে সহিংস পন্থা অবলম্বন না করার ব্যাপারে এরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন এবং এই সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীর ওপর স্থির ও অটল থাকা থেকে সম্ভবত এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, ইসলাম সংস্কারমূলক দাওয়াতে নীতিগতভাবে একটা অহিংস, শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর জন্ম দিতে শুরু করেছ। এই দৃষ্টিভংগী অনুসারে ইসলামী আন্দোলন গুলো সমাজে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে পরামর্শ, ধৈর্য ও অহিংস পন্থা অবলম্বনে অবিচল

www.pathagar.com

থাকবে। শান্তিপূর্ণ ও পরামর্শ ভিত্তিক সংস্কারমুখী সংগ্রামের বিস্তৃতি ঘটবে এবং সংগ্রাম ক্রমশ বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

অপর দিকে আলজেরীয় অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অহিংস ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিরোধের ব্যাপারে অনড় থাকার নীতি ও শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বনের ব্যাপারে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োগের নীতিতে কত পার্থক্য। সরকার বিরোধীরা কখনো কখনো মনে করে যে, সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনই স্থির করবে শান্তিপূর্ণ অথবা সহিংস পন্থা দ্বয়ের মধ্যে কোন পন্থাটি অবলম্বন করতে হবে এবং সেই অনুসারেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

এরপর যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে আলজেরীয় জনগণ সংস্কার ও পরিবর্তন চায়, অতপর শাসক দল ও বিরোধী দল পরস্পরের মুখোমুখী অবস্থান নিল, কিন্তু এ ব্যাপারেও আভাস পাওয়া যেতে লাগলো যে, বিরোধী নেতৃত্ব সশস্ত্র সংঘাত এড়িয়ে যেতে চাইছে এবং তারা বেসামরিক ও অহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ইচ্ছুক, তখন তা শুরুতে শাসক মহলে একটা কাঁপুনির সৃষ্টি করে এবং তার সশস্ত্র বাহিনী ও নির্বাহী দলের নেতৃত্বে ফাটলের সূচনা করে।

অবশেষে সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয়টা ঘটলো তখন, যখন বিরোধী নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, জনগণ নেতৃত্বশূন্য হয়ে গেল। তাদেরকে সহিংসতা পরিত্যাগ করে অহিংস প্রতিরোধ গড়ার পথনির্দেশ করতে পারে এমন কোন নেতা তাদের কাছে রইল না। এ কারণে বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের কিছু কিছু গ্রুপ সহিংসতা ও সশস্ত্র যুদ্ধের আশ্রয় নিল। আর এর মধ্য দিয়েই আলজেরীয়রা ধ্বংস ও সহিংসতার এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার পথে পা বাড়ালো। আর এটা কোন বিশেষ দল বা উপদলের ক্ষতি সাধন করেনি। ক্ষতি সাধন করেছে পুরো একটা জাতির।

আলজেরিয়ার এই দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ঐ দেশটার জনগণকে নীতিগত ও আদর্শগত ভাবে যথেষ্ট গঠনমূলক প্রশিক্ষণ দান করে যথেষ্ট পরিমানে সংস্কৃতিবান করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত নয়। সে কারণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে বিরোধী গোষ্ঠীর কিছু কিছু লোকের বিপথগামী হয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধের আশ্রয় নেয়া সম্ভব আর এ ধরনের প্রশিক্ষণ যদি কিছু উপকার হয়েও থাকে, তবে তা স্থায়ী হয়নি। আলজেরিয়ার ঘটনাবলী ও অনুরূপ অন্যান্য ঘটনা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, কোন জাতির সামগ্রিক চিন্তাধারায় ও সংস্কৃতিতে নেতৃত্ব দানকারী সংস্থাগুলোর ভেতরে সহিংসতার প্রয়োগ একটা রাজনৈতিক বিকল্প ছাড়া আর কিছু নয়। এ বিকল্প কেবল বিবদমান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সেটা হতে

www.pathagar.com

পারে কেবল তখনই, যখন কিছু প্রতিপক্ষের বা সকল প্রতিপক্ষের প্রবলতম ধারণা জন্মে যে, এই বিকল্প ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে।

আলজেরিয়ার দুঃখজনক ও বর্বরোচিত ঘটনাবলীকে বুঝতে হলে আরো একটা কার্যকরণকে বুঝা দরকার। সেটি হলো, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সাথে সংগ্রামের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা, যা আলজেরীয় জনগণ অর্জন করেছিল। আলজেরীয় জনগণের ওপর এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ফরাসীরা যে নিষ্ঠুর ও নৃশংস রক্তাক্ত আগ্রাসন চালিয়েছে এবং যার পরিণতিতে সেখানে রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক গেরিলা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে, তার প্রভাব আলজেরিয় জনগণের মনে রেখাপাত না করে পারে না।

আর এর ফল স্বরূপ কোন কোন দল ভয়ংকর উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে আরম্ভ করে। এ প্রতিক্রিয়া ছিল আলজেরীয় সরকারের নতুন স্বৈরাচার, আগ্রাসন, অরাজকতা, দুর্নীতি, ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। এই সরকার ছিল সাবেক ফরাসী সরকারের স্থলাভিষিক্ত যাকে আলজেরীয় জনগণ দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী গেরিলা সংগ্রামের মাধ্যমে পরাজিত ও বিতাড়িত করেছিল।

এই সাথে আফগানিস্তান, সোমালিয়া ও কুর্দিস্তানের দুঃখজনক সংঘাতময় ঘটনাবলির প্রসংগও এসে পড়ে যা কিনা উপজাতীয় ও উপদলীয় দ্বন্দ্ব, উচ্ছৃংখলতা ও সহিংসতার মানসিকতা, কুচক্রী বিদেশী শক্তিগুলোর লোভাতুর প্রতিদ্বন্দিতা ও প্রতিহিংসাপূর্ণ স্বার্থপরতার উদাহরণ মাত্র। এগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

এ ধরনের আরো বহু উদাহরণ রয়েছে। যা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী চিন্তাধারায় স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী কত জরুরী। এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগী গড়ে উঠবে তখনই, যখন সমাজের অভ্যন্তরে বলপ্রয়োগের যৌক্তিকতার কারণগুলো আমরা জানতে পারবো এবং তার সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরকার ও সংগঠন সমূহের মাঝে সহিংসতা প্রয়োগের পার্থক্য কী, তাও জানতে পারবো।

বস্তুত এ দুটো হচ্ছে সংঘাত ও সহিংসতা প্রয়োগের বিধি ও সেই বিধির সামাজিক ও মনস্তাত্বিক দিকগুলোর একটা পৃথক স্তর। এখানে এ কথাও উল্লেখ করা জরুরী যে, সমাজের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংঘাত নিয়ন্ত্রণে শান্তিপূর্ণ উপায় উপকরণ হস্তগত হওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক শর্ত তাই সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ প্রতিরোধের প্রাথমিক ও নিম্ন পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ উপায় উপকরণের মধ্যে তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখাই সর্বাধিক উপকারী ও উত্তম ব্যবস্থা। বস্তুত সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের প্রতিরোধের স্বত প্রবৃত্ত উদ্যোগের অর্থ প্রধানতম একটা সেবামূলক, বাধ্যতামূলক ও ইতিবাচক পদক্ষেপ সমাজের

www.pathagar.com

আইনানুগ কর্তৃপক্ষের আনুমোদন বহির্ভূত ভাবে যে কোন পর্যায়ের ও যে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা নয়।

আর যখন আমরা আজকের বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থিতিশীলতার দিকে দৃষ্টি দেই, তখন আমরা এই সত্যের সাক্ষাত পাই যে, এই সব দেশের ও সমাজের অভ্যন্তরের এই স্থিতিশীলতার একমাত্র কারণ হলো সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ কর্মপন্থা অবলম্বন ও অনুসরণ। সেই সব দেশে কোন ব্যাপারে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও চূড়ান্ত নিস্পত্তি করা হয়, তবে তা শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃত্বাধীনে ও সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমেই করা হয়–জাতির বিভিন্ন দল ও উপদলের সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে নয়।

মুসলিম সমাজে শান্তিপূর্ণ পন্থায় স্থিতিশীলতা অর্জনের একমাত্র ভিত্তি হলো পরার্মশের মানসিকতা ঃ

মুসলিম সমাজের স্থিতিশীলতা ও তার অভ্যন্তরের সংস্কারকামী আন্দোলন ও উদ্যোগকে যদি সফলকাম ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে সেটা পরার্শমূলক সমাজ ও ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বনকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়া কখনো সম্ভাবপর হবে না।

সুতরাং আমাদেরকে এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, পরামর্শ ভিত্তিক প্রক্রিয়া মূলত এমন একটা অনুশীলনমূলক ও অনুধাবনমূলক বিষয়, যা প্রতিটি মুসলিম জাতির শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পারস্পরিক লেনদেন, আচরণ ও সাংগঠনিক তৎপরতার সকল পর্যায়ে তাদের মন ও মগজে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হওয়া অত্যন্ত জরুরী। পরার্মশ ভিত্তিক প্রক্রিয়া শুধু শাসন কর্তৃপক্ষের এমন প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত ব্যাপার হয়ে থাকাই যথেষ্ট হবে না যার ভেতরে একনায়কত্ব নিত্য নতুন রূপ ধারণ করে ও বিভিন্ন রকমের প্রতারণামূলক ভেক ধরে আত্ম প্রকাশ করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা যে মৌলিক শিক্ষাটা লাভ করতে পারি তা হলো, একটা সংঘবদ্ধ মানব সমাজে যে ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতিই বিরাজ করুক না কেন, রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হিংসাত্মক কর্মপন্থার প্রয়োগ কখনো সঠিক নয়। আর এ ধরনের সমাজে কোন পরিবর্তন ও সংস্কারের কর্মসূচির সফলতা একমাত্র শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পদ্ধতিতে ছাড়া সম্ভব নয়। মজলুম ও নির্যাতিত গোষ্ঠীগুলোর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা জালেম ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মুসলিম জাতির সর্বাত্মক সহানুভুতি ও একাত্মতা সংস্কার প্রচেষ্টার সাফল্য এবং জাতির সার্বিক স্থিতি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতি অর্জনকে নিশ্চিত করতে পারে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদে সহিংসতা

যদিও আমরা মেনে নিয়েছি যে, একটা একক ও সংঘবদ্ধ মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক বিবাদ বিসম্বাদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিরসনে ও নিষ্পত্তিতে শান্তিপূর্ণ কর্মপন্থা ছাড়া অন্য কোন কর্মপন্থা অবলম্বন ইসলামী নীতি অনুযায়ী অন্যায় ও অবৈধ। কিন্তু এ বিষয়টাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ ও সরকার সমূহের মধ্যকার বিবাদ বিসম্বাদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মোকাবিলা ও নিষ্পত্তির বিষয়টির সাথে তালগোল পাকিয়ে একাকার করে ফেলা উচিত হবে না। কারণ ওটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একটা পৃথক স্তর এবং তা ভিন্ন ধরনের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকারণের আওতাধীন।

স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ ও সমাজগুলো যখন পরস্পরের ওপর কোন রাজনৈতিক সংস্কার ও পরিবর্তন চাপিয়ে দিতে চায়, তখন তারা তাদের শাসক গোষ্ঠীর মাধ্যমেই সে কাজটা করতে পারে। আর কোন বিদেশী শক্তির সাথে কোন দেশের দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণ তাদের সরকারের প্রতিই অনুগত হয়ে থাকে ও একাত্মতা প্রদর্শন করে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে যখন স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তি কোন সর্বসম্মত শান্তিপূর্ণ উপায়ে অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের নির্মিত্তে তাদের সামনে অন্যান্য পন্থা ও পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না। আর এই অন্যান্য পন্থা ও পদ্ধতির মধ্যে শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণও অর্ন্তভুক্ত হয়ে যায় যদি তা প্রতিপক্ষ শাসক গোষ্ঠী ও তাদের অনুগত জনগোষ্ঠীকে সবল ও শক্তিমান পক্ষের দাবির কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করার জন্য অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। বস্তুত বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে বিরাজমান বিশেষ বিশেষ মানস্তাত্ত্বিক প্রভাব বলয় ও সম্পর্কের কারণে আন্তর্জাতকি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যকার রাজনৈতিক বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তির প্রয়োজনে যুদ্ধ-বিগ্রহ আগেও প্রচলিত ছিল, এখনো আছে।

www.pathagar.com

সময়ে সময়ে এ ধরনের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে নতি স্বীকারে বাধ্য করার অনিবার্যতার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বিবদমান দেশ ও পক্ষগুলোর মাঝে যোগাযোগ ও মধ্যস্থতার অভাব। তা ছাড়া তাদের পারস্পরিক মনস্তাত্বিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক কখনো কখনো বিদ্বেষ, ও সংঘাতের রূপ নেয়াও এর অন্যতম কারণ। শাসক গোষ্ঠীর ইচ্ছা,স্বার্থপরতা ও তাদের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসিদ্ধি এই বিদ্বেষ ও সংঘাতে ইন্ধন যুগিয়ে থাকে।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জনগণের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও ঐ সমাজের সংস্কার ও সংশোধনের কর্মপদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত আর অন্যান্য সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠী নিজ নিজ জনগোষ্ঠীকে শাসন, তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার, কর্তৃত্ব পরিচালনা এবং শাসকদের ইচ্ছা ও স্বার্থের সম্মানে তাদেরকে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে কী ধরনের কর্মপন্থা অবলম্বন করে থাকে তা রসূল (সা) সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য রসূল (সা) পারস্যের সম্রাট, রোমের সম্রাট, অন্যান্য রাজা ও শাসকদেরকে চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের যে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাতে তিনি ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের দায়দায়িত্বও তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের প্রজাদের ইসলাম গ্রহণের পথে অন্তরায় সৃষ্টির জন্য তারাই দায়ী হবে বলে হুশিয়ার করেছিলেন। এবং কোন বাধাবিপত্তি ও বলপ্রয়োগ ছাড়াই তাদের জনগণের ইচ্ছামত যে কোন ধর্মমত, আকীদা বিশ্বাস ও জগত-জীবন সংক্রান্ত দৃষ্টিভংগী অবলম্বনের মানবীয় অধিকার ছিনিয়ে নেযার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর কয়েকটা চিঠির নমুনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা ও রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হেদায়াতের পথ অনুসরণকারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক অতপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা পাবেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আপনার অনুসারীদেরও পাপের দায় আপনাকে বহন করতে হবে। "বল, হে আহলে কিতাব, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যে কথার ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে, তার দিকে চলে এস। সে কথাটা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা ও আনুগত্য করবোনা এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা একে অপরকে মনিবরূপে গ্রহণ করবোনা। তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তাহলে তোমরা বলঃ "তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান।"

www.pathagar.com

"পরম করুণাময় ও মহাদাতা আল্লার নামে। আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্যের সম্রাট মহান কিসরার প্রতি। যিনি সাঠিক পথের অনুসারী, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনেন ও সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি একক ও শরীকবিহীন এবং মুহাম্মদ তার বান্দা ও রসূল তাঁর প্রতি সালাম। আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি অবিকল আল্লাহর দাওয়াতের অনুরূপ। কেননা আমি সমগ্র মানব জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছি, যেন আমি জীবিতকে সতর্ক করি ও কাফেরদের ওপর সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে সমগ্র অগ্নিউপাসক জাতির পাপ আপনাকে বহন করতে হবে।"

পরম করুনাময় ও মহান দাতা আল্লাহর নামে। আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মিশরের মহান মুকাওকিসের প্রতি। যে ব্যক্তি সাঠিক পথের অনুসারী তার ওপর সালাম। অতপর ঃ আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকতে পারবেন এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। আর যদি প্রত্যাখান করেন, তবে সকল মিশরীয় কিবতীদের পাপের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে। "হে আহলে কিতাব, যে কথায় আমরা ও তোমরা একমত, এস, সে কথার দিকে। সে কথা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা ও আনুগত্য করবোনা, তার সাথে কাউকে শরীক করবো না, এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা একে অপরকে প্রভুরূপে গ্রহণ করবো না। তবুও যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান।"

"পরম করুণাময় ও মহাদাতা আল্লাহর নামে।

এ হচ্ছে হাবশার নেতা নাজ্জশীর কাছে প্রেরিত নবী মুহাম্মাদের চিঠি। যে ব্যক্তি সঠিক পথের অনুসারী, আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনে, সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনি কোন সংগিনী গ্রহণ করেননি, কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং মুহাম্মদ তার বান্দা ও রসূল,তার প্রতি সালাম। আমি আপনাকে আল্লাহর আহবান দ্বারাই আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আল্লাহর রসূল। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকতে পারবেন। "হে আহলে কিতাব, যে বাণীতে আমরা ও তোমরা একমত সে বাণীর দিকে এস। সে বাণী হলো, আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত না করি, এবং পরস্পরকে প্রভু রূপে গ্রহণ না কির। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তাহলে বল,তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান।" আপনি যদি এ আহ্বান অগ্রাহ্য করেন, তবে আপনার জাতির খৃষ্টানদের পাপের দায় আপনার ওপর বর্তাবে।

www.pathagar.com

এভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার লক্ষ্য ছিল, মানুষকে তার ধর্ম নির্বাচন ও ভাগ্য নির্ধারণের স্বাধীনতা প্রধান। যে ধর্মেরই অনুসরণ করতে সে আগ্রহী হয়, তা তাকে নির্বাচন করতে দেয়াই তার নীতি।

লক্ষণীয় যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে এমন কিছু চায়নি, যা সে নিজের ওপর ও নিজের বিধিব্যবস্থার ওপর কার্যকর করেনি। দখলীকৃত অঞ্চলের প্রজাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে, এমনকি বিদ্রোহী প্রজাদেরকে পর্যন্ত ধর্ম ও আইন নির্বাচনে ও তাদের নিজস্ব প্রশাসন পরিচালনায় স্বাধীনতা দিয়েছে। ধর্মবিশ্বাসের এই স্বাধীনতা সমাজ সভ্যতা ও চিন্তাগত পরিপক্কতার অধিকারী তাওরাতের অনুসারী ইহুদী, ইনজীলের অনুসারী খৃষ্টান ও আগুনের পূজারী মাজুসরাও ভোগ করতে পেরেছিল। আর এই নীতি অনুসারে সে সকল সভ্য-সংস্কৃতি সচেতন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক পরিপক্কতার অধিকারী জাতিগুলোকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের স্থায়ী নীতি চালু করেছে, যাতে পরবর্তীকালে মুসলমানদের ওপর অন্য সকল সভ্য জাতিকে ধর্ম, আকীদা বিশ্বাস ও জীবন যাপন পদ্ধতি নির্বাচনের স্বাধীনতা প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে।

সুতরাং কোরআনের আয়াতে "আহলে কিতাব" (কিতাবধারী) শব্দটির 'কিতাব' দ্বারা যে মানব সামাজের চিন্তাগত, সামাজিক ও সভ্যতাগত পরিপক্কতাকেই বুঝানো হয়েছে, তা রসূলের (সা) বাস্তব আচরণ থেকে অকাট্য ভাবে প্রমাণিত। এটা কোন বিশেষ কিতাব বা বিশেষ ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেমনটি অনেকে মনে করে থাকে। এ কারণে রসূল (সা) স্বতন্ত্র্য সভ্যতা ও বিধিব্যবস্থার অধিকারী পারসিকদের সাথে আহলে কিতাবের তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও পারসিকরা মোশরেক ও অগ্নি উপাসক ছিল। এ থেকেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এখানে 'কিতাব' শব্দটা সভ্যতা, সমাজ পরিপক্কতা ও অগ্রসরতারই প্রতীক।

এখান থেকে এই রহস্যও উদঘাটিত হয় যে, প্রাথমিক যুগের মরুচারী আরব পৌত্তলিক গোত্রগুলোর সাথে ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নি-উপাসকদের থেকে ভিন্ন ধাচের আচরণ করা হয়েছে। বস্তুত এর উদ্দেশ্য ছিল, আরব গোত্রগুলোকে সামাজিকতা ও সভ্যতার আদিম স্তর থেকে সামাজিকতা ও সভ্যতার পরিপক্কতার স্তরে উন্নতি করা। আর এ উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার কোন সংশ্রব ছিল না। নির্বাচনের স্বাধীনতা তাকেই দেয়া যেতে পারে যার বোধশক্তি ও বিবেচনার ক্ষমতা আছে॥ যার বোধশক্তি ও বিবেচনা শক্তি অসুম্পর্ণ ও অপরিপক্ষ তাকে নয়।

www.pathagar.com

যখন সুসভ্য রোমক ও পারসিক শাসক গোষ্ঠী ও তাদের তৎকালীন অনুসারীরা তাদের জনগণের ঘাড়ে একনায়ক হয়ে চেপে বসলো তাদের অনুসারী ও সাধারণ জনগণকে স্বাধীনভাবে নিজেদের আকীদা ও ধর্ম নির্বাচনের অধিকার দিতে সম্মত হলোনা এবং যারা নিজেদের আকীদা ও ধর্ম নির্বাচনের জন্মগত স্বাধীনতা ও অধিকার দাবী করে, তাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে ও বলপ্রয়োগ করতে লাগলো, তখন রসূল (সা) এর আমলে ও তৎপরবর্তী খেলাফতে রাশেদা ও আরো পরবর্তী কালের বেশির ভাগ মুসলিম সরকারগুলোর কাছে এই সব শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাদের সংশোধন অথবা পতন ঘটানো ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকলো না। একমাত্র এভাবেই এই সব দেশের জনগণকে স্বাধীনভাবে ধর্মবিশ্বাস নির্বাচনের অধিকার দেয়া সম্ভব ছিল। অধিকার দেয়ার পর যার ইচ্ছা ইসলাম গ্রহণ করবে, যার ইচ্ছা নিজস্ব ধর্মের ওপর বহাল থাকবে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক সরকারগুলোর মাঝে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগ কোন কোন রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ নিরসনের চূড়ান্ত কর্মপন্থা হয়ে দেখা দিতে পারে।

বর্তমান কালের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন, প্রতিষ্ঠান ও চুক্তি বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে ন্যায়বিচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানবাধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দানকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। এসব আইন প্রতিষ্ঠান ও চুক্তি এই সব উদ্দেশ্যে সফল করতে যতটা কার্যকর প্রমাণিত হয়, রাজনৈতিক বিরোধ নিরসনে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে শক্তি প্রয়োগ, সহিংসতা ও যুদ্ধের প্রয়োজন ততটাই হ্রাস পায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

শক্তি প্রয়োগ ও তাবেদার সরকার

তৃতীয় একটা ক্ষেত্র এমনও রয়েছে, যাতে রাজনৈতিক বিরোধ ও সংঘাত নিরসনে শক্তি প্রয়োগ ও সহিংস পন্থা অবলম্বনের বৈধতা নির্ণয়কারী নীতিমালা বেশির ভাগ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট মনে হয়। এই জটিল সমস্যা দেখা দেয় কোন বিদেশী শক্তির ইচ্ছা আকাংখার কাছে নতি স্বীকারকারি তাবেদার দেশ ও সরকারের সামনে। আধুনিক যুগের এ ধরনের বিদেশী পরাক্রান্ত শক্তি ও তার তাবেদার সরকারের উজ্জ্বলতম উদাহরণ হচ্ছে (অধুনা লুপ্ত) সোভিয়েট আধিপাত্যধীন পূর্ব ইউরোপ, মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের অবস্থা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চল সুয়েজখালে প্রতিরক্ষা ও দখলদারীর অধীন মিশরীয় রাজতন্ত্র এবং অন্যান্য বৃটিশ উপনেবেশের অবস্থাও তদ্রুপ।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে সংস্কারকামী দলগুলোর মধ্য থেকে যারা যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়, তাদের অনেকেই বিদেশী পরাক্রান্ত ও আগ্রাসী শক্তির ধবজাধারী ও তাবেদার স্বদেশী শাসক দলের বিরুদ্ধে সহিংস পন্থা অবলম্বনে অনুপ্রাণিত হয়। বিদেশী শক্তির শৃঙ্খল মুক্ত হওয়া, যুলুম প্রতিরোধ ও স্বৈরতান্ত্রিক বাধাবিপত্তি দূর করার উদ্দেশ্যেই তারা হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করতে আগ্রহী বা বাধ্য হয়। কিন্তু স্বদেশী তাবেদারদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণ চালানোর সময়ে এই যুলুম ও নির্যাতনের আসল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বিদেশী শাসকদের স্বার্থের কোন ক্ষতি সাধণ করতে পারে না। কারণ সেই শক্তি তাদের স্বদেশী শাসকদের কাছ থেকে কাঠামোগতভাবে অনেক দূরে অবস্থিত।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে তাবেদার শাসকদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পন্থা প্রয়োগ করা ভুল। কেননা এ দ্বারা জাতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে সশস্ত্র সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়বে এবং সে পরিস্থিতিতে জাতি বিবদমান পক্ষগুলোর বিরোধ মেটাতে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম

www.pathagar.com

হবে না। পরিণামে এই সশস্ত্র সংঘাত গোটা জাতিকেই দুর্বল করে ফেলবে এবং জাতির ওপর বিশেী শক্তির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠা করা ও তার নির্যাতনমূলক সাম্রাজ্যবাদকে পাকাপোক্ত করে নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করা অধিকতর সহজসাধ্য হয়ে যাবে। আর এ জন্য তাকে আগের চেয়েও কম শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হবে।

বস্তুত শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যকার রাজনৈতিক বিরোধ ও সংঘাত নিরসনে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন সর্বাবস্থায়ই অন্যায় ও অবৈধ হয়ে থাকে। হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনের ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে এবং যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘাত উভয় পক্ষের জন্য আত্মরক্ষামূলক ও অস্তিত্ব রক্ষামূলক হয়ে দাঁড়ায়। আর যে বিরোধের কারণে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে, তার সাথেও আর কোন সংস্রব থাকে না। বরং সেই সব বিরোধ অনেক পেছনে নিক্ষিপ্ত হয় এবং বিবেচনাহীন ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘাত সংঘর্ষ থেকে কোন কল্যাণ বা উপকারিতা লাভ হয় না এবং কোন মুক্তি ও সংস্কারের লক্ষ ও অর্জিত হয় না। এতে সেই স্বদেশী শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থও উদ্ধার হয় না যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও রাখে না, বরং তারা বিদেশী অধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর ক্রীড়নকে পরিণত হয়। তাদেরকে বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তি নিছক জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার এবং তার ওপর ও তার রাজনৈতিক স্বার্থের অপূরণীয় ক্ষতি সাধনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। যে সমস্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে এই তত্ত্বটি দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা জরুরী বলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, তন্মধ্যে ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ আন্দোলন অন্যতম। ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের দমনমূলক পদক্ষেপসমূহের জবাবে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন না করাই তাদের কর্তব্য।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই পরিস্থিতি অর্থাৎ দেশীয় শাসক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিদেশী পরাক্রান্ত শক্তির তাবেদারী ও ক্রীড়নকত্ব বিভিন্ন বিবদমান জাতি ও পক্ষ সমূহের মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সাথে সংযুক্ত হয় এবং এর প্রকৃত প্রতিপক্ষ হলো আধিপত্যশীল বিদেশী শক্তি। সুতরং সংঘাত সংঘর্ষ ও সহিংসতা যদি করতেই হয়, তবে তা করা উচিত বিদেশী শক্তির সাথে– পরাজিত স্বদেশী শাসক গোষ্ঠীর সাথে নয়, যারা প্রকৃত পক্ষে অন্যের তাবেদার। এরূপ ক্ষেত্রে যে সংঘাত সংঘটিত হবে, তা আন্তর্জাতিক সংঘাত-সংঘর্ষের নিয়মেই সংঘটিত হবে এবং সহিংস পন্থা প্রয়োগ করতে হবে কিনা, আর করলে কতটুক করতে হবে, তা বাস্তব পরিস্থিতি ও বৃহত্তর স্বার্থের নিরীখে নির্ণিত হবে।

www.pathagar.com

সহিংসতাকে একমাত্র পরাক্রান্ত বিদেশী অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে চালিত করলে ও তার মধ্যে সীমিত রাখলে জাতির ঐক্য ও একাত্মতা সংরক্ষিত হয়, সেই সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত মোজাহেদরা একটা আবরণও লাভ করে। একই সংগে জাতীয় সরকার অধিকতর শক্তি ও সমর্থন লাভ করে। এবং কিছুটা অনুশীলন ক্ষমতা ও স্বাধীনতা অর্জন করে, যা পরিণামে মুক্তি, অধিকার ও সম্মান ফিরিয়ে আনতে জাতির শক্তিকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

বিদেশী স্বৈরাচারী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারকর্মীদের পক্ষ থেকে প্রয়োজন অনুপাতে ও পরিস্থিতির দাবি অনুসারে সহিংস তৎপরতা চালানোর অনুমতি থাকলেও ইসলামের আলোকে সহিংসতার অপপ্রয়োগ ও যথেচ্ছা বাড়াবাড়ি বৈধ নয়। শুধুমাত্র শক্তি সামর্থের মাত্রা ও প্রয়োজনের মাত্রা অনুপাতে এবং ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন, কল্যাণ লাভ ও ক্ষতি রোধের নিশ্চয়তার ভিত্তিতেই সহিংসতা প্রয়োগ করা যাবে।

এভাবে সহিংসতা সংক্রান্ত মূলনীতিটি এরূপ দাঁড়ায় ঃ স্বদেশী রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের মধ্যে সহিংসতাও শক্তির প্রয়োগ অবৈধ ও নিস্ফল। পক্ষান্তরে ন্যায়বিচার,স্বাধীনতা ও প্রতিরোধকামীদের পক্ষ থেকে বিদেশী আগ্রাসী শাসকদের বিরুদ্ধে সাধ্য অনুযায়ী ও সম্ভাব্য উপায়ে শক্তি প্রয়োগ ও সহিংস কর্মপন্থা অবলম্বন সম্পূর্ণ বৈধ, তবে তাতে মাত্রাতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করা চলবেনা। প্রয়োজনীয় মাত্রার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে, যাতে আগ্রাসী হাতকে হটিয়ে দেয়া, স্বার্থ উদ্ধার করা ও ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হয়। এরপর যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষ শান্তিতে ও ন্যায়বিচারের দিকে ঝোঁকে, তাহলে মুসলমানদের ও মযলুমদেরও উচিত হবে তাদের দিকে ঝুঁকে পড়া। সূরা মায়েদার ৮ম আয়াতে বলা হয়েছেঃ কোন জাতির সাথে তোমাদের বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেই তা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে বিরত থাকতে প্ররোচিত না করে।" আর সূরা আনফালের ৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

> "তারা (প্রতিপক্ষ) যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও তার দিকে ঝুঁকে পড় ও আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। নিশ্চয় তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন "।

অপরদিকে এ বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার যে, বিবিধ প্রকারের রাজনৈতিক সম্পর্ককে যাতে একাকার করে ফেলা না হয়, সে ব্যাপারে যেমন সতর্ক থাকতে হবে, তেমনি সম্মিলিত স্বার্থের খাতিরে একাধিক দেশ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গড়ে ওঠা মজবুত সম্পর্ক যে, অনিবার্যভাবেই এ সব দেশ ও

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর আধিপত্য বিস্তারেই নামান্তর, সে কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ভারত্বের তারতম্য কিংবা আংশিক বা পর্যায়গত বৈপরিত্য- যা কোন কোন স্বার্থের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে, নিছক রাজনৈতিক সম্পর্কের সাময়িক প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কখনো কখনো তা সম্মিলিত স্বার্থ ও সম্পর্কের জন্য অপরিহার্য হয়েও দেখা দিতে পারে।

মনে রাখতে হবে, শাসক দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সহিংসতা ও শক্তি প্রয়োগের পরিণতি এ ছাড়া আর কিছু হয় না যে, গোটা জাতির ঐক্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, জাতির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক অচল হয়ে যায়, এবং জাতির ভেতরকার অবস্থার যথার্থ সংস্কার ও সংশোধন ও যুলুম প্রতিহত করার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মনে শক্তি ও সহিংসতা প্রয়োগ সর্বাবস্থায় বিদেশী আগ্রাসী শক্তির স্বার্থ উদ্ধারের সহায়ক হয়ে থাকে। ফলে ঐ জাতির ওপর উক্ত বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর করা সহজতর হয়ে যায় এবং ঐ বিদেশী শক্তি আপন উদ্যোগে প্রদত্ত সহায়তাক্রমে তার নিকৃষ্টতম ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়।

যে অত্যাচারী বিদেশী শক্তি একটি জাতির মৌলিক স্বার্থের ক্ষতি সাধন করে ঐ জাতির ও তার স্বার্থের ক্ষতি সাধনের কারণে তার নিজের স্বার্থ যদি ক্ষতিগ্রস্থ নাও হয়, তথাপি সে তার এ ঐ অজআবহ জাতি বা তার শাসক মহলের ক্ষয়ক্ষতিকে উপেক্ষাও করতে পারবে না। বরঞ্চ দুর্বল ও পরাধীন জাতিগুলোর শাসক মহলের ভেতরে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের আগুন জ্বাললে তা হয়তো সমগ্র জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করবে এবং বিরোধী ও শাসক নির্বিশেষে সকলকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর এর ফল দাঁড়াবে এই যে, ঐ জাতির ভেতরে উপদলীয় সংঘাত ব্যাপক আকার ধারণ করবে। এটা বিচিত্র নয় যে এটাই হয়তো আধিপত্যবাদী অত্যাচারী বিদেশী শক্তির লক্ষ্য এবং এর জন্য সে প্রায়ই চেষ্টা চালায়, যাতে সে এই জাতিগুলোর ওপর নিজের আধিপত্য ও অত্যাচার অব্যাহত রাখতে পারে।

সম্ভবত ন্যায়সংগত মানবাধিকার আন্দোলনকে পৃথিবীতে কাজ করার সুযোগ দিলে আন্তদেশীয় ও আভ্যন্তরীণ অত্যাচার আগ্রাসন ও সহিংসতা অনেকাংশে কমে আসতে পারে।

পবিত্র কোরআনের নির্দেশাবলী, রসূলের (সা) উপদেশ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অতীত ও বর্তমানকালের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত এই শিক্ষা থেকে দ্বার্থহীনভাবে জানা যায় যে, মুসলিম সমাজে বলপ্রয়োগ ও সহিংসতা বর্জন করাকে কৌশলগত ও ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়, বরং নীতিগত ও বাধ্যবাধকতামূল ব্যাপার

www.pathagar.com

গণ্য করা অপরিহার্য। রাজনৈতিক দল উপদলগুলোর মধ্যে সহিংসতা বর্জনের এই নীতিগত বাধ্যবাধকতা মেনে চললে পরামর্শমূলক রাজনৈতিক পদ্ধতিতে সব ধরনের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধও বিতর্কের অবসানে তা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

মাঝে মাঝে এমন কিছু কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যখন মুসলমানদের অনেকে শক্তিপ্রযোগ ও সহিংসতাকে রাজনৈতিক বিরোধ নিস্পত্তির জন্য অপরিহার্য, সফলদায়ক ও আইন সংগত বলে মনে করে। তবে তারা এর জন্য প্রকৃত উপযুক্ত পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় না। আর উপযুক্ত পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে সক্ষম না হওয়াই সম্ভবত মুসলিম জাতি ও গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে যুগ যুগ ব্যাপী দ্বন্দ-সংঘাত, বিভেদ, বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ চলতে থাকার প্রধান কারণ। অথচ এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী সংঘাতও গৃহযুদ্ধ কোন বিরোধেরই চূড়ান্ত নিস্পত্তি করতে সক্ষম হয়নি। বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম জাতি গোষ্ঠী সমূহের শাসন ও ব্যবস্থাপনায় অধিকতর নিপীড়ন, স্বৈরাচার ও সীমা লংঘনমূলক কর্মকাণ্ড উস্কে দিয়েছে। উস্কে দেয়ার এই ধারা অতীতের ন্যায় বর্তমান কালেও অব্যাহত রয়েছে।

এই সুস্পষ্ট অসতর্কতা ও উদাসীনতা, উপযুক্ত পরিস্থিতি চিহ্নিত করনে অক্ষমতা ও ব্যর্থতা, শোচনীয় ভুলত্রুটি, এবং বিচার বিবেচনার অদক্ষতা যা ইসলামী চিন্তাধারা এবং মুসলিম চিন্তাবিদ ও শাসকদের মনমস্তিষ্কে বিভ্রান্তি ও বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছে, এর প্রধান কারণ ছিল নিত্যনতুন চালেঞ্জের উদ্ভব, পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রতিকার, তার চাহিদা ও তাৎপর্য উপলব্ধিতে ব্যর্থতা মুসলিম শাসনাধীন এলাকার ভৌগলিক বিস্তৃতি ও প্রসার এবং বহু সংখ্যক জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রাগৈইসলামিক চিন্তাধারা ও উত্তরাধিকার ইসলাম গ্রহণ। এই উপকরণ ও কার্যকারণগুলো ইসলামের বিধিসম্মত ও সর্বব্যাপী দৃষ্টিভংগী ও বিচার বিবেচনা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও বিষয়গুলোকে সর্বব্যপী মূলনীতির আলোকে পর্যালোচনার সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। আর এর অনিবার্য ফল স্বরূপ সর্বস্তরের বিপুল মুসলিম জনতা ও বহু সংখ্যক মুসিলম জাতিগোষ্ঠীর পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর ও ইতিবাচক ইসলামী পরামর্শ ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি ভন্ডুল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। অন্যদিকে ইসলামের আংশিক জ্ঞান চর্চার প্রধান্য প্রাবল্য এবং মুসিলম জনগণের অতীতের কিছু অনৈসলামিক ধ্যানধারণা মানুষের বিচার বিবেচনা ও দৃষ্টিভংগীর অসচ্ছতাকে এবং অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করার অক্ষমতা জনিত শূন্যতাকে আরো গভীর করেছে। কোন্ পরিস্থিতিতে শক্তিপ্রয়োগ ও সহিংসতা বৈধ এবং পরিণামে তা দ্বারা সুফল লাভের আশা করা যায়, আর কোন্ পরিস্থিতিতে সহিংসতার প্রয়োগ অন্যায় এবং পরিণামে তাদ্বারা

www.pathagar.com

কোন সুফল লাভের আশা করা যায়না- সেটা চিহ্নিত করতে না পারা ও তালগোল পাকিয়ে উভয় পরিস্থিতিকে একাকার করে ফেলার প্রবণতা মুসলমানদের ভেতরে অনেকাংশে বেড়ে গেছে। এ কারণে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর ভেতরে কিংবা পরস্পর বিরোধী স্বাধীন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে উদ্ভূত বিরোধের নিস্পত্তির উপায় হিসাবে শক্তি প্রয়োগের স্বার্থকতাও ক্ষীণ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

যুলুম প্রতিরোধ ও ত্বরিত পরিবর্তনপ্রিয়তার প্রতিকারের পন্থা হিসাবে হিজরত বা অভিবাসন

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অনিবার্যভাবেই হিজরত বা অভিবাসনের প্রসংগটাও এসে পড়ে। কেননা বিবদমান গোষ্ঠী সমূহের সাথে আচরণ ও তাদের পরস্পরিক উত্তেজনা প্রশমনে ওটা একটা উপায় ও বিকল্প।

রাজনৈতিক বা ধর্মীয় হিজরত দ্বারা মূলত জন্মভূমি পরিত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণকে বুঝানো হয়ে থাকে। আর এটা সংঘটিত হয় তখনি, যখন জন্মভূমির সাথে সংশ্লিষ্টতা বা তার প্রতি আসক্তি ও আকর্ষণ কমে যায় বা ফুরিয়ে যায়, অথবা প্রচারক ও নিপীড়িতদের ওপর নির্যাতন যুলুম আগ্রাসন ও সংঘাতের মাত্রা এত বেড়ে যায় যে, তাদের পক্ষে সহ্য করা আর সম্ভব হয়না। এ হিজরত পর্যটন বা অর্থনৈতিক হিজরত থেকে আলাদা জিনিস। যা বক্তিগত উদ্যোগে এবং জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সংঘটিত হয়ে থাকে, আর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগী ও স্বার্থের নিরীখেই তার মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এ প্রসংগেই রসূল (সা) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যেই হয়েছে। আর যার হিজরত সংগটিত হয়েছে কোন পার্থিব স্বার্থের তাগিদে বা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশে, তার হিজরত ও যে উদ্দেশে সে হিজরত করেছে, সে উদ্দেশেই হয়েছে।"

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হিজরত কখনো কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং এটা মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে হয়ে থাকে। এটা সংঘটিত হয় নির্যাতন ও নিপীড়ন যখন ধৈর্য্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং মজলুম ব্যক্তির পক্ষে তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। এটা পলয়নী হিজরত। যখন কোন নিরীহ ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এর শিকার হয়, তাকে রক্ষা করা বা সাহায্য করার

www.pathagar.com

মত কেউ থাকেনা, এবং সেই অত্যাচার প্রতিহত করার শক্তি ও কৌশল কোনটাই তার আয়ত্বে থাকনো, তখন ইসলামও হিজরত করার নির্দেশ দেয়। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দরুন নিপীড়নের শিকার ব্যক্তিবর্গের ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। আশঙ্কা দেখা দেয় তাদের মানবাধিকার, মানবীয় স্বাধীনতা ও সম্মান ক্ষুণ্ন হবারও। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> "ফেরেশতারা যাদেরকে এমন অবস্থায় প্রাণ সংহার করবে যে, তারা নিজেদের ওপর জুলুম করে ফেলেছে, তাদেরকে ফেরেশতারা বলবে ঃ তোমরা কী অবস্থায় ছিলে ? তারা বলবে ঃ আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে ঃ আল্লাহর পৃথিবী কি এতটা প্রশস্থ ছিলনা যে, তোমরা সেখানে হিজরত করতে পারতে ? বস্তুত তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, এবং তা প্রত্যাবর্তন স্থল হিসাবে খুবই খারাপ। তবে সেই সব দুর্বল পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুর কথা আলাদা, যাদের কোন কৌশলও আয়ত্বে নেই এবং কোন বিকল্প পথেরও সন্ধান পায় না। (আন্ নিসা ঃ ৯৭-৯৮)

এ ধরনের হিজরত যদিও আত্মরক্ষামূলক, কিন্তু ধর্ম, জীবন, ও মানবাধিকার রক্ষার্থে কখনো কখনো এজ ইসলামের দাবীতে পরিণত হয়ে থাকে, অধিকারের প্রতি উদাসিনতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন এবং সংস্কার সংশোধন ও অত্যাচার প্রতিরোধের চেষ্টা থেকে পিচটান দেয়া কখনো হিজরতের উদ্দেশ্য হওয়া চাই না। কখনো কখনো স্বদেশে অনুকূল পরিস্থিতি ফিরে আসার অপেক্ষায় সাময়িকভাবে হিজরত করা হতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কৃত হিজরত জালেম ও স্বৈরাচারী নিপীড়কদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মজলুমদের প্রতিরোধ আন্দোলনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অত্যাচারীদের প্রতাপ ও দৌরাত্ম্যের প্রভাবাধীন এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপাততঃ নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা পাওয়া, ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রোধ করা, সম্ভাব্য সুদিন ফিরে আসা ও অপেক্ষাকৃত উত্তম পরিবেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতঃ চূড়ান্ত পর্যায়ে যুলুমের অবসান ঘটানো ও সত্যের জয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের হিজরতের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ধরনের হিজরত বর্তমানে প্রচলিত রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের নিকটতম অবস্থা। মক্কার মুসলমানদের ওপর কোরাইশ নেতাদের পক্ষ থেকে নির্যাতন পরিচালনার পর্যায়ে হাবশা অভিমুখে মুসলমানরা প্রথম ও দ্বিতীয়বার যে হিজরত করে, সেটাও ছিল এ ধরনের হিজরত। মোশরেক নেতা ও মোশরেক জনতার অধিকাংশ তখন অনুভব করেছিল যে, মুসলমানরা ও তাদের পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন তাদের স্বার্থ ও

www.pathagar.com

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জীবন ব্যবস্থার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে তাদের প্রতি মোশরেকদের মমত্ববোধ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের ওপর নানা রকমের নিষ্ঠুর নির্যাতন পরিচালনায় প্ররোচিত হয়।

আবার কখনো কখনো হিজরত চিরতরে জন্মভূমি ত্যাগের নামান্তর হয়ে থাকে। জন্মভূমিতে পরিচালিত যুলুম নিপীড়ন এবং অধিকার ও স্বাধীনতা হরণের কর্মকাণ্ডকে বন্দ করে দেয়ার লক্ষ্যে দেশের বাইরে গিয়ে অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহন ও তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করার নিমিত্তে এ ধরনের হিজরত করা হয়। মক্কার মুসলমানদের মদিনায় হিজরত ও এ ধরনেরই হিজরত ছিল। মুসলমানরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলযে, মক্কাবাসীর পক্ষ থেকে তাদেরকে মেনে নেয়ার আর কোনই আশা নেই এবং স্বজাতি সুলভ মমত্ববোধ সহকারে তারা আর কখনো তাদেরকে আপন জন হিসাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করবে না। এ কারণেই তারা হিজরত করলেন এবং মদিনাতে তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও কোরাইশ শত্রুদের মোকাবিলার জন্য ঘাঁটি হিসাবে গ্রহণ করলেন। শেষ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় এল। এ দ্বারা দেশ ও জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলো। স্বৈরাচার ও বলপ্রয়োগ যুগের অবসান ঘটলো ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এরপর সেই পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, যার সম্পর্কে রসূল (সা) বলেছেন ঃ বিজয়ের পর আর হিজরত থাকবে না। তবে জেহাদ ও নিয়ত থাকবে।" এই নমুনাটা ইহুদীদের আগ্রাসী যায়োনিষ্ট ইহুদীদের আরবদের ভূমি জবরদখলের উদ্দেশ্যে ও ফিলিস্তিনীদেরকে বিতাড়নের লক্ষ্যে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে সমবেত হওয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা যে ফিলিস্তিনী আরব জাতি আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে একজন ইহুদীরও আবির্ভাবের পূর্ব থেকে ফিলিস্তিন ভূখন্ডে বসবাস করে আসছে, তাদেরকে বহিস্কারের উদ্দেশ্যে ইহুদীরা সারা পৃথিবী থেকে এসে ফিলিস্তিনে জড়ো হয়েছিল। আধুনিক যুগে আমরা বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অহরহ হিজরত করতে দেখে থাকি। তাদের মধ্য থেকে অনেকে পলায়নী হিজরত করে। আবার কেউ কেউ করে সাময়িক হিজরত। কিন্তু সকলেই যে দেশে আশ্রয় নেয়, সেই দেশের সরকারের মাধ্যমে স্বদেশের সরকারের ওপর তার নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের সীমিত করার জন্য চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। অনুরূপভাবে ঐ সব সংখ্যালঘু ও প্রবাসী সম্প্রদায় নিজ নিজ জনগণের সেবার লক্ষ্যে চাঁদা সংগ্রহ করে থাকে। এ সব চাঁদার অর্থ দিয়ে তারা তাদের নিজ দেশে নানা ধরনের সংস্কারমূলক ও ত্রাণমূল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এইসব সংখ্যালঘু প্রবাসী সংখালঘু হওয়ায় প্রাপ্ত আবাসিক সুবিধা ও সহায়

www.pathagar.com

সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে এবং তাদের নিজ দেশে সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনের সমর্থনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে সক্ষম হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও তার সহানুভূতি অর্জনের নীতির আলোকে মোহাজেরদের কর্তব্য হলো, আশ্রয় দাতা দেশে বসবাসকালে ভেতর থেকে সহিংসতা উস্কে দেয়ার চেষ্টা করবে না এবং তার কারণও ঘটাবে না। বরঞ্চ অন্য কেউ উস্কানি দিলে তারাতা প্রতিহত করবে। কিন্তু যারা চিরতরে হিজরত করেছে, তাদের ব্যাপারটা ভিন্নতর। কেননা এ ধরনের হিজরতের ফলে মক্কা ও মদিনার মত বৈরী রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। এ ধরনের বৈরী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘত আন্তর্জাতিক সংঘাতেরই শামিল এবং স্বাধীন সংঘাতমুখর রাষ্ট্রসমূহের ওপর যে ধরনের নিয়মবিধি প্রযোজ্য, এদের ওপরও অবিকল সেই ধরনের নিয়মবিধি প্রযোজ্য।

ইসলামী হিজরত কোন অবস্থায়ই আত্মসমর্পণ নয়। অনুরূপভাবে তা অধিকার ও স্বাধীনতার দাবি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ারও নাম নয়। এটা হলো জুলুম প্রতিহত করা, ঈমান রক্ষা করা, মানবাধিকার রক্ষা করা ও দুর্বলদেরকে সাহায্য করার লক্ষ্যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী সাধ্যমত পদক্ষেপ গ্রহণের একটা কৌশল। অনুরূপভাবে, তা আইসংগত পন্থায় ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অথবা প্রয়োজনে ও পরিস্থিতির আনুকূল্য সাপেক্ষে যুদ্ধের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সত্যের সংগ্রামের তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা মাধ্যম। তবে মনে রাখতে হবে যে, এটা এমন দেশে ছাড়া হতে পারেনা যেখানে হিজরতকারী মুসলমানরা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকতে পারবে এবং তাদের ঈমান, মানবাধিকার ও ইসলাম সম্মত স্বাধীনতাগুলোকে রক্ষা করতে পারবে ন্যুনতম ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়েও সম্ভাব্য সর্বোত্তম পর্যায়ে।

মদীনার হিজরতকে আমরা যদি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে, নিজ মাতৃভুমির বাইরের যে দেশটিতে মুসলমানরা হিজরত করে আশ্রয় নেয়– প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে যেখানেই হোক না কেন– সেখানে বর্তমান সময়ে ইসলামের দাওয়াত দিলে ঐ দেশটি তাদের পরিত্যক্ত দারিদ্র পীড়িত বা নির্যাতন-পীড়িত স্বদেশের বিকল্প একটা শান্তি ও আরামের দেশে পরিণত হতে পারে। আশ্রিত দেশে অবস্থানকালে সেখানে ইসলামের দাওয়াত দেয়া তাদের অবশ্য কর্তব্য। মুসলিম মোহাজের যে দেশেই হিজরত করুক, এবং যে অবস্থায়ই থাকুক, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। সেখানে কিছু লোক দাওয়াত গ্রহণ করলে তা নিশ্চিতভাবেই তার সেই দেশের চাইতে উত্তম দেশে পরিণত হবে, যেখান থেকে

www.pathagar.com

সে পালিয়ে এসেছে। মোহাজের হিজরতকৃত দেশের জনগণের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হবে এবং তাদেরকে হেদায়াত করার মাধ্যমে তাদের সাহায্য ও ভ্রাতৃত্ব অর্জন করতে পারবে। আধুনিক কালে উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও বৃটিশ ও মার্কিন নেতৃত্বের সমর্থন নিয়ে তাদের মুষ্টিমেয় সংখ্যলঘু ইহুদীরা সারা পৃথিবী থেকে যেভাবে ফিলিস্তিনে সমবেত হয়ে নিজেদের জাতীয় আবাসভূমি গঠন করেছে, এবং তাদের দেয়া অর্থ ও অস্ত্রের বলে বলীয়ান হয়ে যুলুম ও আগ্রাসনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনকে দখল করে ফিলিস্তিনের আদি অধিবাসীদের রক্ত ঝরিয়েছে ও তাদরেকে সারা পৃথিবীতে বিতাড়িত করেছে, সেটি হিজরতের একটা ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন উদাহরণ। তবে ইহুদী হানাদারদের হিজরত ও রসূল (সঃ) এর সাহাবীদের হিজরতের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। তারা হিজরত করে দেশ দখল করেছে যুলুম ও আগ্রাসনের মাধ্যমে, আর মুসলমানরা মদিনায় হিজরত করেছে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেছে ভাতৃত্ব ও হেদায়াতের মর্মবাণী প্রচারের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

সভ্যতায় সভ্যতায় সংঘাত

মানবীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আরো একটা রূপ রয়েছে। সেটি হচ্ছে, সভ্যতায় সভ্যতায় সংঘাত ও জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ। এ দ্বন্দ্ব সংঘাতও আবার কয়েক রকমের হয়ে থাকে। কোনটা ইতিবাচক, কোনটা নেতিবাচক, কোনটা শান্তিপূর্ণ, আর শান্তিপূর্ণ হওয়ার কারণে আলাপ আলোচনা ও অব্যাহত যোগাযোগ তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, আবার কোনটা উগ্র ও জংগীবাদী এবং সে কারণে সংঘর্ষ ও সহিংসতায় পরিপূর্ণ।

সভ্যতায় সভ্যতায় এই যে সংঘাত, এর মূল উপাদান হলো আধিপত্য, নেতৃত্ব ও অবদানের প্রতিযোগিতায় একে অপরকে পেছনে ফেলার নিরন্তর প্রচেষ্টা। বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্পর্কে ও বিভিন্ন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ও জীবন যাপন পদ্ধতিতে সৃষ্ট বিড়ম্বনা ও অচলাবস্থা এ প্রচেষ্টাকে জোরদার ও তীব্রতর করে। কেননা এই বিড়ম্বনা ও অচলাবস্থা অধিকতর শক্তিশালী ও ভারসাম্যের অধিকারী পক্ষকে দুর্বলতার শেষ বিন্দুতে ঠেলে দেয় এবং এর পরিণতিতে সে তার শূন্যতা পূরণ করতে ও অক্ষমতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। দুর্বলতার শেষ বিন্দুতে ঠেলে দেয়ার এই কাজটা কখনো সম্পন্ন হয় শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং প্রভাব বিস্তার আপোষ রফা, পারস্পরিক আদান প্রদান ও লেনদেনের মাধ্যমে সেটা হয়ে থাকে। আবার কখনো সে কাজটা হিংসাত্মক পন্থায়, সংঘাত ও সংঘর্ষের মাধমে এবং বল প্রয়োগ আগ্রাসন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়।

শান্তিপূর্ণ ও আপোষমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে সভ্যতায় সভ্যতায় গঠনমূলক সংঘাতের একটা রূপ, যা সংস্কার, উন্নয়ন, প্রগতি নিশ্চিত করে এবং জ্ঞান পিপাসা জাগ্রত করে। মহান আল্লাহ মানবীয় প্রকৃতিতে এই গুণগুলোকে সংরক্ষণ করেছেন এবং মানবীয় প্রকৃতিকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে, সে এগুলো অর্জনের আকাঙ্খা পোষণ করতে বাধ্য। সভ্যতায় সভ্যতায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বরা দুনিয়ার সকল জাতি তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য ফিরিয়ে

www.pathagar.com

আনার প্রয়াসে এবং সভ্যতাগত প্রশান্ত অর্জনের সংগ্রামে অধিকতর সফল হয়। এর মাধম তারা তাদের জীবনে কোন না কোন দিক দিয়ে উৎকৃষ্টতর ও অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি খুঁজে পায়।

পক্ষান্তরে সভ্যতায় সভ্যতায় ও জাতিতে জাতিতে আগ্রাসনমূলক ও সহিংস সংঘর্ষ সামগ্রিকভাবে সভ্যতার দুর্যোগের বিভিন্ন স্তর ছাড়া আর কিছু নয়। এগুলো মানব সভ্যতার বিড়ম্বনাকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে এবং বিশ্ব মানব সমাজকে অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ সভ্যতার সন্ধানে ও সভ্যতার উৎকৃষ্টতর স্তরে উন্নীত করার প্রচেষ্টায় আরো দীর্ঘকাল নিয়োজিত রাখতে পারে, যা মানব সমাজের জন্য শোচনীয় দুর্ভোগ বয়ে আনবে। সন্দেহাতীতভাবে এর চেয়ে অনেক ভালো এমন গঠনমূলক ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় প্রতিযোগিতা করা, যা গঠনমূলক ও ন্যায় সংগত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং মানবজাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চাকাকে অধিকতর সমন্বয় ও সাহসের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে দিতে পারে।

আজকাল পাশ্চাত্য ও মুসলিম বিশ্বের দুই সভ্যতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। ভাবখানা এই যে, মুসলিম বিশ্ব ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের ইতিহাসে এটা যেন একটা নতুন বিষয়। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই দুই সভ্যতার দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা কয়েক শতাব্দি আগেই শুরু হয়েছে। এটা শুরু হয়েছে ইসলামী সভ্যাতার উন্নতি ও সমৃদ্দির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন ও তার গঠনমূলক, জনমন্দিত মুসলিম আধিপত্য ও কর্তৃত্ব লাভের পর থেকে যা পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির হৃদয়কে একাত্ম করে নিয়েছিল এবং তাদের সভ্যতাগুলোকে নিজের সভ্যতার সাথে একীভূত করে নিয়েছিল।

উসমানী সাম্রাজ্য ও ইসলামী সভ্যতার কাঠামোগত ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটা ও দুর্বলতা দেখা দেয়ার কারণে পাশ্চাত্য ও মুসলিম বিশ্বের সভ্যতার এই দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা তার শেষ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী ও শোষণমূলক নেতিবাচক বলপ্রয়োগ ও আধিপত্যের ভূমিকা পালন করা শুরু করেছে। আর এই অবস্থাটা পাশ্চাত্য শক্তিকে আধিপত্যবাদী আগ্রাসনে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করছে, যাতে মুসিলম বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং তাকে পাশ্চাত্যের স্বার্থের সামনে নতি স্বীকার করানো যায়। এ কারণে এই দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা এমন একটা তিক্ত, দীর্ঘস্থায়ী ও নেতিবাচক সামরিক সংঘাতে রূপ নিয়েছিল, যা সহিংস পন্থায় পাশ্চাত্যের আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে, তার ফ্যাসিবাদী, জড়বাদী, বর্ণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে এবং তার বাস্তববাদী, ভোগবাদী ও নাস্তিকবাদী পঁচা নোংরা রীতিনীতিকে মুসলিম জাহানের ওপর চাপিয়ে দিতে নিরন্তর সচেষ্ট ছিল।

www.pathagar.com

উল্লিখিত দুটো সংঘাতমুখর বিশ্ব সভ্যতার এই নেতিবাচক প্রতিযোগিতার প্রকৃতি পাল্টে গিয়ে ইতিবাচকে পরিণত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। ইতিবাচকে পরিণত হলে সেই সব মানবীয় বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে, যা মুসলিম বিশ্বকে বস্তুগতভাবে ও পশ্চিমা জগতকে আধ্যাত্মিকভাবে আহত করেছে। উক্ত নেতিবাচক প্রতিযোগিতার ইতিবাচকে পরিণত হওয়া কেবল তখনই সম্ভব, যখন উভয় সভ্যতার মধ্যকার ইতিবাচক উপাদানগুলোর মাঝে পারস্পরিক উদ্বুদ্ধকরণ ও সমন্বয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানব সভ্যতার ইতিবাচক ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং এই দুই সভ্যতার বিনির্মানগত প্রকৃতির নিরীখে এবং উভয়ের অগ্রগতির ইতিহাসের আলোকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও উভয় সভ্যতার মংগল সাধনের লক্ষ্যে সভ্যতার অগ্রগতির এই সংগ্রামটা শান্তিপূর্ণ, ইতিবাচক ও গঠনমূলক উপায়ে পরিচালিত হওয়াই বাঞ্চনীয়

যে আংশিক বস্তুগত শক্তি পাশ্চাত্য বুদ্ধিবৃত্তির হস্তগত, তার জন্য ইসালামের মহাজাগতিক চেতনার আওতাভুক্ত তাওহীদবাদী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণাংগ শক্তি অর্জন অত্যন্ত জরুরী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমা ও ইসলামী বিশ্বের মাঝে সভ্যতার এই প্রতিযোগিতার ভবিষ্যতের দিকে ইতিবাচক পন্থায় দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, যাতে তা সংঘাতে নিকটতর হওয়ার পরিবর্তে সংলাপ ও মতবিনিময়ের নিকটতর হয়।

বস্তুত শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা, গঠনমূলক আলোচনা, তামাদ্দুনিক উন্নতি, প্রগতি ও জ্ঞানের অন্বেষণই হচ্ছে ইসলাম সভ্যতার আসল ভিত্তি। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বলেনঃ "ইসলামে কোন বল প্রয়োগের অবকাশ নেই।" (আল-বাকারা ঃ ২৫৬)

"যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর আক্রমণ চালায়না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাসগৃহ থেকে বহিস্কার করে না, তাদের প্রতি সদাচরণ ও সুবিচার করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। বরঞ্চ সুবিচারকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। আল্লা তো শুধু সেই সব লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা তোমাদের ওপর ধর্মের ব্যাপারে আক্রমণ চালায় এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা অত্যাচারী।" (আল-মুমতানা ঃ ৮-৯)

"নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচার, মহৎ আচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য প্রদানের আদেশ দেন, আর অশ্লীলতা অন্যায় ও ব্যভিচার

www.pathagar.com

করতে নিষেধ করেন। তোমরা যাতে স্মরণ করতে পার, সে জন্য তিনি তোমাদেরকে নিরন্তর উপদেশ দেন।" (আন্-নাহল ঃ ৯০)

"হে আহলে কিতাব, এমন একটা বাণীর দিকে এস, যার ব্যাপারে, আমরা ও তোমরা একমত। বাণীটি এই যে, আমরা যেন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো আনুগত্য না করি। তার সাথে আর কাউকে শরীক না করি, এবং আমরা একে অপরকে আল্লাহর বিকল্প মনিব হিসাবে গ্রহণ না করি। কিন্তু তারা যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলমান। (আল-ইমরান ঃ ৪৬)

"তোমরা ভালো কাজ ও মন্দ কাজ বর্জনে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং গুনাহর কাজে ও অত্যাচারে পরস্পরকে সহযেগিতা করোনা।" (আল-মায়েদা ঃ ২) পড় তোমার সেই প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (আল-আলাক ঃ ১)

"বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হয় ? একমাত্র বিবেকবান লোকেরাই তো শিক্ষা গ্রহণ করে। বল, হে আমার ঈমানদার বান্দারা তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা পৃথিবীতে সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আর আল্লার যমীন তো প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে বিনা হিসাবে প্রতিদান দেয়া হয়।" (আয যুমার ঃ ৯-১০)

"বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তারপর দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন।" (আল-আনকাবুত ঃ ২০)

" আর তিনি আকাশে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছুকেই তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন।" আল জাছিয়া ঃ ১৩)

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ইহলোকেও কল্যাণ দাও, পরকালেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে দোজখের আযাব থেকে নিস্কৃতি দাও।" (আল-বাকারা ঃ ২০১)

"আর বল, তোমরা কাজ করতে থাক, আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনগণ তোমাদের কাজ দেখবেন।" আাত-তাওবা ঃ ১০৫)

মদিনার সনদ, নাজরানের খৃষ্টানদেরকে দেয়া রসূল (সা) এর প্রতিশ্রুতি, অগ্নিউপাসক ও তারকাপূজারীদের সাথে রসূল (সা) কর্তৃক আহালে কিতাবের মত

www.pathagar.com

আবরণ, মুসলমানদের সাথে যারা শান্তিতে থাকতে চায় তাদেরকে যিম্মী তথা চুক্তিবদ্ধ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম নাগরিক রূপে অভিহিত করন এবং এ কারণে কোন মুসলমান বা অমুসলমানকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও আকিদা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কিছু গ্রহণে বা বর্জনে বাধ্য করা যায় না, যুদ্ধরত প্রত্যেক মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক বিজয়ী মুসলিম সেনাদলগুলোকে নির্দেশ প্রদান, এসবই ইসলামের সূচনাকাল থেকেই তার সভ্যতাসূলভ শান্তি কামিতা ও ইতিবাচকতা তার উদারতা, তার সংলাপপ্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সমন্বয় প্রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ। বর্তমান আন্তর্জাতিকতার যুগে ইসলামের এই সভ্যতা চেতনা তার শান্তিপূণ, প্রগতিশীল ও সভ্যতাসুলভ বক্তেব্যের বদৌলতে এই উত্তরাধিকারের অধিকতর উপযোগী। কেননা এই উত্তরাধিকারকে কাজে লাগিয়ে সে সভ্যতায় সভ্যতায় সংলাপ, মানবসেবামূলক শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিমুখী সভ্যতা ও পৃথিবীর বুকে তার খেলাফতের বাণী বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই পটভূমিতে আজকের নেতিবাচক ও আধিপত্যবাদী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটানো যেমন জরুরী, তেমনি পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পক্ষগুলির নৈতিক ও বস্তুগত শক্তির যথাযথ উপলব্ধি অর্জন এবং পারস্পরিক মত বিনিময়ও অপরিহার্য। এ দ্বারা এই নেতিবাচক দ্বন্দ্ব সংঘাতকে এমন একটা আদান-প্রদান প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা যাচ্ছে, যা ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার, পারস্পরিক সাহায্য ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কাছে সভ্যতার অনুকূল ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

আজকাল যে ধরনের নেতিবাচক দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে এবং যেভাবে কেউ কেউ এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আগুনে ঘি ঢালছে, তাদ্বারা যুলুম নিপীড়ন ওবেদনাদায়ক ঘটনাবলী ঘটানো, মানবাধিকার লংঘন এবং উভয় সভ্যতায় চলমান সংস্কার আন্দোলন গুলোকে ব্যাহত করা ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। তাই নেতিবাচক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে এমন একটা ইতিবাচক আদান-প্রদানে রূপান্তরিত করার এখনই সময়, যার ভিত্তি হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সংলাপ ও মত বিনিময়, সখ্যতা ও সমমর্মিতা, এবং প্রত্যেক পক্ষের ইতিবাচক উপকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়া। এতে করে আজকের এই বিশ্ব পল্লীতে এমন এক নজীরবিহীন মানবিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, যা অতীতে কখনো হয়নি এবং যা আজকের মত এত সম্ভাবনাময়ও আর কখনো ছিল না।

জাতিতে জাতিতে ও সভ্যতায় সভ্যতায় ইতিবাচক আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াটা মূলত সভ্যতার অনুকূল ভূমিকা ও ভারসাম্যের উচ্চতর স্তরগুলোর দিকে

www.pathagar.com

ওঠার প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রতিযোগিতা যখন সংলাপ ও সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ উপায় অনুসরণ করে পরস্পরের পরিপূরক ও ইতিবাচক আদান প্রদান প্রক্রিয়ার দিকে এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবমূর্তির প্রতি ও তার চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিকে এগিয়ে যায়, তখন তা বিরাট ইতিবাচক অবদান রাখে।

ইসলামের রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক মূলনীতি, বিধিমালা, ও সীমারেখা, যা মানবীয় সমাজ ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য। বিশ্ব প্রকৃতির অন্যান্য অংশের জন্য নিয়ম শৃঙ্খলার প্রয়োজন, তেমনি মানুষ্য সমাজের জন্যও এর প্রয়োজন রয়েছে। নচেত তার ধ্বংস অনিবার্য ছিল।

ইসলামের এই সব মূলনীতি জানা বর্তমানে পাশ্চাত্যের জন্যও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কেননা এই মূলনীতিগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতার সীমারেখা চিহ্নিত করে, এবং সংরক্ষণ করে মানুষের ব্যক্তি সত্তাকে ও তার মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে। আজকের বিশ্বে একমাত্র ইসলামই পাশ্চাত্য জগতকে সেই বিধিবিধান উপহার দিতে সক্ষম, যা দ্বারা সে তার সভ্যতার ভারসাম্য, সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্থিতিশীলতা, এবং গোপন ও প্রকাশ্য উভয় ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ঐক্য ও অবিভাজ্যতা রক্ষা করতে পারে। ইসলামের যে জটিল ও অকাট্য ঐশী বিধান রয়েছে, যার সমতুল্য ও বিকল্প কোন বিধান পাশ্চাত্যের কাছে নেই, তার মাধ্যমেই সে পাশ্চাত্যকে সেই ভারসাম্যপূর্ণ বিধিবিধান উপহার দিতে পারে। তাই আজ পাশ্চাত্য জগতে যারা ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্বকে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের দিকে ঠেলে দিতে সচেষ্ট, যাতে তা নেতিবাচক ও আগ্রসী রূপ পরিগ্রহ করে, তাদের এই চেষ্টা থেকে বিরত হওয়া উচিত। কেননা এ চেষ্টা কখনো সহিংসতাকে বন্ধ বা প্রশমিত করবে না। অনুরূপভাবে তা ইসলামী সভ্যতাকেও ধ্বংস করতে পারবে না। কেননা এ সভ্যতা ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় এবং মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদার মর্মমূলে। সহিংসতা ও বলপ্রয়োগ উস্কে দেয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন ও সংলাপের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারসাম্যকেই আরো বেশি করে ব্যাহত করবে। উভয় সভ্যতার ইতিবাচক দিকগুলো দ্বারা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টাকে তা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এই নেতিবাচক প্রচেষ্টা সারা পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ, বেদনা, দুর্ভোগ, তিক্ততা ও বিপর্যয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে, দীর্ঘায়িত করবে উভয় সভ্যতার মাঝে সহযোগিতা, সমমর্মিতা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মেয়াদকে। ফলে বিশ্ব সভ্যতার প্রত্যাশিত সংস্কার ও সমন্বয় বিলম্বিত হবে।

www.pathagar.com

অথচ এই সংস্কার ও সমন্বয় পাশ্চাত্যের ও মুসলিম বিশ্বের স্বার্থকে সমভাবেই উপকৃত, সংরক্ষিত ও নিশ্চিত করতে সক্ষম।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় যে বস্তুগত শক্তি ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা নিহিত রয়েছে, তা দ্বারা লাভবান হবার জন্য যথাসাধ্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা মুসলিম চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য। এভাবে মধ্যপন্থী মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী সভ্যতা বস্তুগতভাবে তার কার্যকারিতা ও ভারসাম্য পুনবহাল করতে সক্ষম হবে। উক্ত ভারসাম্য আভ্যন্তরীণভাবে অর্জন করার জন্য পাশ্চাত্যের সাথে গঠনমূলক সংলাপের ব্যবস্থা করাও মুসলিম চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য। পাশ্চাত্যবাসীর কাছে ইসলামী সভ্যতার তাওহীদবাদী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও মতবাদ সমূহ উপস্থাপন করেই তারা এই কর্তব্য পালন করতে পারেন। এই সব মূল্যবোধ ও মতবাদ পাশ্চাত্যের অনেক উপকার ও কল্যাণ সাধন করতে পারে এবং তার মানবিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য সামাজিক ভারসাম্য ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে। এর অভাবে শুধু পাশ্চাত্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতি নানা রকমের অরাজকতা, সামাজিক বিকৃতি, অপরাধমূলক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও অপরিমেয় অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে চলেছে। আর ভবিষ্যতে এর আরো যে কত বিষময় পরিণাম তাদেরকে ভোগ করতে হতে পারে, তা কল্পনা করাও দুসাধ্য এবং তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

এই সাথে পাশ্চাত্যেরও কর্তব্য বস্তুগত ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে বলপ্রয়োগ ও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা না করে এবং ইসলামী সভ্যতাকে শেষ করার ব্যর্থ চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে পারস্পরিক সংলাপ ও আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া চালু করা। তার মনে রাখা উচিত যে, ইসলামী সভ্যতা অন্য যে কোন সভ্যতার তুলনায় সেই সব মানবীয় উপাদানে অনেক বেশি পরিমাণে সমৃদ্ধ, যা তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। স্বার্থপর ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত উগ্রপন্থীরা যুদ্ধ বলপ্রয়োগ, আধিপাত্যবাদ, ও ধ্বংসের যে আওয়াজ তুলছে পাশ্চাত্য ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে যারা উত্তেজনা ও লড়াই উস্কে দিতে সচেষ্ট, এবং যারা এই উভয় সভ্যতাকে ভারসাম্য ও মানবীয় সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে উচ্চতর স্তরগুলোতে আরোহনে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে তৎপর, তাদের আহ্বানে পশ্চিমা চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের আর কর্ণপাত করা উচিত নয়।

বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকামী লড়াই এর পৃষ্ঠপোষকতা বর্তমান যুগে একটা বর্বরোচিত ধৃষ্টতাপূর্ণ, রক্ষণশীল, অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অপরিণামদর্শী কাজ, যার অশুভ পরিণাম বিশ্ব সমাজের পক্ষে অসহনীয়। এ ধরনের অবাঞ্ছিত সংঘাতের হোতাদের ও তাদের কুপ্ররোচনাদায়ক আহ্বানের কোন স্থান

www.pathagar.com

সমকালীন বিশ্বে নেই। কেননা তাদের আহ্বান মানবতার ধ্বংস, বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতির আহ্বান ছাড়া আর কিছু নয়। বুদ্ধিমান মানব গোষ্ঠীর পক্ষে এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান না করার কোন যুক্তি নেই।

সুতরাং চূড়ান্ত বিবেচনায় যে বিষয়টা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, যে বিষয়টা জ্ঞানীগুণী ও বোদ্ধাদের হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য তা হচ্ছে মানব জীবনের মানোন্নয়ন, সমন্বয় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং জাতিতে জাতিতে ও সভ্যতা সভ্যতায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতাদ্বয়ের মাঝে পারস্পরিক সংলাপ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, মত বিনিময়, স্বার্থ বিনিময় ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা অত্যন্ত জরুরী। এই বিনিময় অন্যান্য সভ্যতার মধ্যেও হওয়া জরুরী। কেননা এই বিনিময় ও সংলাপ সমকালীন সভ্যতা সমূহের মাঝে প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় আদান প্রদান ও সভ্যতায় সভ্যতায় গঠনমূলক প্রতিযোগিতা তদারকীর একমাত্র মাধ্যম ও উপায়। একমাত্র এই উপায়েই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা ও লাভজনকভাবে প্রভাব বলয় সম্প্রসারিত করা সম্ভব।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ওহির বাণীকে ব্যাপকতর অর্থে অনুধাবন ও ইতিহাসকে ভালোভাবে অধ্যায়ন করার মধ্যেই সমাধান নিহিত

মুসলিম উম্মাহ সভ্যতা সম্পর্কে যে জটিল চিন্তাগত সংকটে ভুগছে, তা থেকে তাকে উদ্ধার করতে হলে কুরআনের বাণী ও রসূলের আদর্শের নির্ভেজাল পরিপূর্ণ তত্তগত উপলব্ধি অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহ ও তার চার পাশের বিশ্ব যে রীতি প্রথা, স্বভাব প্রকৃতি, ঘটনাবলী ও ঐতিহাসিক শিক্ষা অর্জন করেছে, সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অর্জন করাও অত্যাবশ্যক।

প্রত্যাশিত পূর্ণাংগ ইসলামী তাত্ত্বিক ও চিন্তাগত সংস্কার যতক্ষণ সফল না হয়, ততক্ষণ সভ্যতার সংস্কারের ভিত্তি গড়ার লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের কাজ অবিলম্বে শুরু করে দেয়া অপরিহার্য। শুরু করে দেয়া উচিত ইসলামী শিক্ষার সেই নির্ভেজাল ও নিখুঁত ভিত্তি স্থাপনের কাজ, যা সামাজিক উন্নয়নে মনস্তত্ত্বের শিক্ষাকে, বিশেষত শিশু উন্নয়নের মনস্তত্ত্বের শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। ইতিবাচক বাস্তব শিক্ষাকে বিশেষত শৈশব ও বাল্যকাল পর্যায়ে শিক্ষাকে বুঝাবার জন্য উক্ত মনস্তত্ত্বের শিক্ষাকে সর্বাদিক গুরুত্ব দিতে হয়। কেননা শৈশব ও বাল্যকালেই ব্যক্তির মানসিক গঠনের কাজ সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। বস্তুত মুসলিম ব্যক্তিসত্তাকে প্রকৃত তওহীদবাদী, স্বাধীন, অগ্রণী , ইতিবাচক, সৃজনশীল, এবং ন্যায়নিষ্ঠ চিন্তা ও চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিরূপে পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে এটা হচ্ছে বুনিয়াদী কাজ। এ ধরনের মুসলিম ব্যক্তিসত্তা যথার্থ খেলাফতপন্থী ইসলামী পরামর্শ ভিত্তিক সমাজ গঠনের সুযোগ্য ভিত্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করে। এরূপ ভিত্তির ওপর গঠিত ইসলামী সমাজেই থাকে সম্মানজনক ও উদার জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ এবং এ ধরনের সমাজই হয়ে থাকে টেকসই ও স্থিতিশীল।

বস্তুত ইসলামী তাত্ত্বিক, চিন্তাগত ও জ্ঞানগত পর্যালোচনাই হচ্ছে ইসলামী চিন্তাধারার সংস্কার ও সংশোধনের একমাত্র পথ। এই ইসলামী চিন্তাধারা বর্তমানে স্বাধীনতা ও আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধারের ধাপ অতিক্রম করছে এবং এই অভ্রান্ত চিন্তধারা মুসলিম উম্মাহকে ও তার সকল জাতিসত্তাকে মানুষ ও সামাজি প্রতিষ্ঠানগুলো গড়বার শক্তি যোগায়। আর এই গড়ার কাজের শুরুতে সর্বাগ্রে সেই

www.pathagar.com

খেলাফতপন্থী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংশোধন করতে হবে যা, সৃজনশীল, ইতিবাচক মানসিকতা ও স্বাধীন, শক্তিশালী ইসলামী চিন্তাধারা গঠন করে। তাই প্রত্যেক মুসিলম ব্যাক্তিসত্তাকে সঠিক ইসলামী জ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত করে। এ ধরনের খেলাফত পন্থী মুসলিম ব্যক্তিবর্গের ও তাদের আকীদাগত, মানসিক, জ্ঞানগত সামষ্টিক সুস্থ ভিত্তির মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ তার হারানো শক্তি পুনরুদ্ধার, তার প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্নির্মাণ, তার জ্ঞানগত ও গুণগত ঐক্য পুনর্গঠন এবং তার রাজনৈতিক বিবাদ মীমাংসায় ক্রমাগত সন্ত্রাস ও সহিংসতা প্রয়োগের অবসান ঘটাতে পারে। আর মুসলিম উম্মাহর চিন্তাধারায় ও সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ পরামর্শ প্রিয় মানসিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়, সহিংসতার স্থলে কুশলতা ও প্রজ্ঞার প্রয়োগ এবং লড়াই এর স্থলে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় উক্ত মানসিকতা ও উক্ত তত্ত্বই যথেষ্ট। এই প্রক্রিয়ায় মুসলিম উম্মাহর সকল স্তরে ও তার সকল জাতির পারস্পরিক সম্পর্কে গঠনমুখি উন্নয়ন ও শান্তির উন্মেষ ঘটবে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সহিংসতা প্রয়োগের সঠিক স্থান সমূহ চেনা ও সেই স্থানগুলোর মধ্যেই তাকে সীমিত রাখার অবিচল সংকল্প সহিংসতার সমস্যার প্রকৃত সমাধান। এই সমাধানই মুসলিম উম্মাহর সর্বনাশ সাধনকারী তিক্ত ও উদ্ধত পারস্পরিক দ্বন্দ-সংঘাতের ধারাবাহিকতাকে থামিয়ে দিতে পারে এবং শাসক দল ও বিরোধী দলের সংঘর্ষকে স্তব্ধ করতে পারে॥ তা এই সংঘাত ও সংঘর্ষের কারণ যাই হোকনা কেন।

আমার মতে, হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো তার মূল পাঠ। মূল পাঠ যদি বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে তা যত নিখুঁত ও প্রমাণ্য সূত্রেই বর্ণিত হোক না কেন, তার কোন মূল্য থাকে না। এ ধরনের মূল পাঠের বাস্তবায়ন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। তবে যখন মূল পাঠের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু অগ্রাহ্য ও অস্বীকৃত হয় না, কিন্তু সাঠিক তাত্ত্বিক মাপকাঠি ও প্রামাণ্য সূত্র অনুসারে গ্রহণযোগ্য হয়না। তখন এ ধরনের পাঠ প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয় না। বিশিষ্ট আলেমগণ এ ধরনের পাঠকে 'আছর' (বর্ণনাকরী সাহাবীর উক্তি এর চেয়ে বেশী কোন মর্যাদা দেন না রসূলের (সঃ) সুন্নাহর মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুসারে এই নীতিই সাঠিক ও উত্তম। পক্ষান্তরে সন্য (বর্ণনাসূত্র পরম্পরা) যখন, ত্রুটিপূর্ণ হয়, তখন তা বর্ণনা করা, জনগণের কাছে প্রচার করা, তার ভিত্তিতে শিক্ষা দান ও ফতোয়া দান সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা জরুরী। আমারে মতে, এটাই সার্বিক নীতি। রসূল (সঃ) এর মর্যাদার আলোকেই এটাই উত্তম। তবে যখন হাদিসের পাঠ অদৃশ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়, যা কোন বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি বা আন্দাজ অনুমানের আওতায় আসে না, তখন সে বিষয়ে একীনী তথা অকাট্য প্রত্যয়যোগ্য তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করা অবৈধ। এই অকাট্য প্রত্যয় একমাত্র কোরআন অথবা মুতাওয়াতির হাদীস, সর্বোচ্চ সতর্কতা সহকারে তার পাঠ ও সনদ গ্রহণ এবং তার সাঠিক অর্থ, উদ্দেশ্য ও তার প্রচারের নিগুঢ় রহস্য উপলব্ধি করার মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। এ ধরনের মুতাওয়ারিত হাদিসকে কুরআন হিসেব প্রচার না করে হাদিস হিসাবে প্রচারের নিগুঢ় রহস্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করা কর্তব্য।

মূলনীতি হিসাবে জানা দারকার যে, ইসলামের এমন কোন মৌলিক বিধান বা মূল্যবোধ, যা সর্ব সাধারণ জনগণের জানা ও মান্য করা জরুরী। তা একটা প্রত্যয়যোগ্য সূত্রের মাধ্যমেই জনগণের কাছে পৌছাতে, হবে, এবং আদৌ কোন সন্দেহ, সংশয়, ভুলভ্রান্তি বা মিথ্য ও ধোকার সম্ভাবনা থাকে এমন কোন সূত্রে পৌছানো চলবে না।

বর্তমান যুগে তথ্য অর্জনের যত রকমের সুযোগ সুবিধা আমাদের হাতে রয়েছে, স্থান ও কালের ব্যবধানে মানুষ সংক্রান্ত যত রকমের তথ্য অর্জনের সূত্র আমাদের আয়ত্বাধীন রয়েছে, এবং আমরা বর্তমানে যত রকমের ছমকীর সম্মুখীন। সে সবের আজ আমরা যত কিছু জানতে ও বুঝতে পারি, অতীতের প্রজন্মগুলোর পক্ষে তা জানা ও বুঝা দুরুহ অথবা অসম্ভব ছিল। আমি মনে করি, এ যুগে জ্ঞানার্জনের সূত্র ও সুযোগ সুবিধার প্রাচুর্য রয়েছে, এবং মানুষের সমকালীন চাহিদা ও প্রয়োজনের যে তাড়না ও দাবির বাহুল্য রয়েছে, তাতে আলেমদের একাংশ গোঁড়া ও অন্ধ অনুকরণপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের চিন্তা ও গবেষণা শক্তিকে কাজে লাগাতে নিস্পৃহ হবে না। কারণ মুসলিম আলেমদের মধ্য থেকে যারা ইতিপূর্বে উদাসীন ছিল এবং স্থবিরতা, জড়তা, অনুকরণপ্রিয়তা ও অক্ষমতা তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল, উদ্দীপাময় বাণীসমূহ ও সতর্কবাণী সমূহের পুনঃ পুনঃ কষাঘাতে তারা অতীতের সে জড়তা কাটিয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

এখানে এ কথাটাও উল্লেখ্য যে, মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরে আজকাল শাসক দল ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সশস্ত্র সংঘর্ষগুলো হচ্ছে তার বেশির ভাগের মূলে রয়েছে সরকারী যুলুম নিপীড়ন এবং জনগণের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা, যার দীর্ঘস্থায়ীত্ব মুসলিম জনগণকে অনেকটা অসহিষ্ণু ও অস্থির করে তোলে।

আর এ কারণে আমাদের বুঝা উচিত যে, দলীয়, উপদলীয় ও বিরোধী দলীয় সংঘাতে আকীদাগত উপাদানের আবির্ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিছক নৈতিক বাহানা ছাড়া আর কিছু নয়, যার ছুঁতো দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো সহিংস পদ্ধতি প্রয়োগকে বৈধ করতে চায়। অথচ যুলুম নির্যাতনই তাদের সহিংসতায় প্ররোচিত হওয়ার একমাত্র কারণ।

মুসলিম দেশগুলোতে কস্মিনকালেও শান্তি আসবে না এবং আপোষ রফা ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ না মুসলিম সমাজের সকল দল-উপদল ও বিরোধী দল পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে যে, সহিংস পন্থা অবৈধ, যতক্ষণ না সর্বস্তরের জনগণের মাঝে বিষয়টি সূর্যের আলোর মত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং যতক্ষণ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সহিংসতা ও হটকারিতার স্থলে শান্তিপূর্ণ পরামর্শভিত্তিক কর্মপন্থা অনুসৃত হবে।

জনগণের সমস্যাবলীর সমাধান ও যুলুম নিপীড়ন বন্ধ করতে উদ্যোগী হওয়া শাসকদের কর্তব্য। আর বুদ্ধিজীবী, আলেম ও শিক্ষকগণের কর্তব্য সহিংসতার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী মৌলিক নীতিমালাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা, এবং সকল দল-উপদলের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করা যাতে শিক্ষাদীক্ষায়, শাসন কার্যে, মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণে, তাদের ঐক্য সংহত করণে, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের ক্ষমতা অর্জন, এবং তার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংগঠনসমূহ স্থাপনে সক্রিয়ভাবে কাজ করা যায়।

মুসলিম দেশগুলোর বিরাজমান রাজনৈতিক বিবাদ বিসম্বাদ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রকৃত কারণগুলোকে উপেক্ষা করা কখনো শাসক দলগুলোর জন্য কল্যাণকর হয় না। এই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলোকে উপেক্ষা করলে আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত দল উপদলগুলোর দুর্বলতা, অক্ষমতা, এবং রক্তপাত, ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু অর্জিত হয় না।

পক্ষান্তরে এর বিদেশী আগ্রসী হানাদারের বিরুদ্ধে ন্যায়সংগত ও আইনসম্মত সহিংসতা প্রয়োগ সীমিত পর্যায়ে অথবা ব্যাপকতর পর্যায়ে সকল আধিপাত্যবাদী দেশের স্বার্থকে হুমকীর সম্মুখীন করে। যেসব দেশে মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

বিষয়ে নাক গলায়, তাদের ওপর যুলুম ও শোষণ চালায়, তাদের স্থীতিশীলতা নিরাপত্তা ও উন্নয়নকে ব্যাহত করে, সে সব দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সহিংস প্রতিরোধ অনিবার্যভাবেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

হানাদার বিদেশী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে আক্রান্ত জাতিগুলো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ও ধৈর্য্যের সাথে নিজ দায়িত্ব পালনে যত্নবান হলে তার ফলে হানাদারদের স্বার্থ রক্ষার ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাওয়া এবং আগ্রাসি বিদেশী শক্তি যে উদ্দেশে যুলুম,. নিপীড়ন, আভ্যান্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, বিভেদ সৃষ্টি, ও রক্তপাতের মত অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য নস্যাত হওয়া অবধারিত হয়ে যাবে এবং সে তার ঐ সব অপকর্মের সুফল থেকে নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত হবে। অবশেষে আগ্রাসী শক্তি তার যুলুম নিপীড়ন থেকে নিবৃত্তি হবে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। এ যুগের মানব সভ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে এটাই সর্বোত্তম আচরণ।

এ ক্ষেত্রে যে জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও অনিয়মতান্ত্রিক প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। এর প্রত্যেকটারই আলাদা চরিত্র, বৈশিষ্ট, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, উপায় উপকরণ রয়েছে। এ কথা ঠিক নয় যে, নিয়মতান্তিক যুদ্ধ দ্বারা বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনতার প্রাণহানি হয় না। বরঞ্চ আমরা যদি প্রাণহানির পরিমাণটা হিসাবে ধরি, তাহলে দেখতে পাই, নিয়মতান্তিক যুদ্ধে যত নিরস্ত্র ও বেসামরিক লোক হতাহত হয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি হতাহত হয় অনিয়মিত প্রতিরোধ যুদ্ধে। আসল ব্যাপার হলো, প্রতিরোধ যুদ্ধের দুর্বল পক্ষ শত্রু পক্ষের অবস্থানকে নড়বে ও অস্থিতিশীল করতে সচেষ্ট থাকে। তার শক্তি নিঃশেষ করে, তার বাহিনীর ভেতরে আতংক ছড়িয়ে দিয়ে, তার রসদ সরবরাহ বিঘ্নিত করে, এবং তার নিয়মিত বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও পুনরায় তার হিসাব নিকাশ পর্যালোচনা করতে বাধ্য করে তার অবস্থানকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। অনিয়মিত প্রতিরোধ যুদ্ধের অন্যতম উদাহরণ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান দখলদারীর বিরুদ্ধে ফরাসী ও রুশ প্রতিরোধ যুদ্ধ, ফরাসী দখলদারীর বিরুদ্ধে আলরেজরীয় স্বাধিনতা যুদ্ধ, ফরাসী ও মার্কিন দখলদারীর বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং প্রোটেস্টান্ট সংখ্যাগুরু আয়ার্ল্যান্ডীয়দের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক আয়ার্ল্যান্ডীয়দের প্রতিরোধ যুদ্ধ। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় এধরনের আরো বহু উদাহরণ রয়েছে।

যুলুম নিপীড়ন ও আগ্রাসনের কুফল সম্পর্কে উদাসীনতা ও উপেক্ষা অথবা তা অব্যাহত থাকার পাশাপাশ সহিংসতা প্রয়োগ ও আত্মসংযম না করা অধিকতর সহিংসতা ও সশস্ত্র সংঘর্ষের বিস্তারকে অনিবার্য করে তোলে। আর এই কর্মকাণ্ড

www.pathagar.com

তখনই ঘটে, যখন সংঘর্ষের কোন পক্ষ সংঘর্ষকে প্রশমিত বা প্রতিহত করতে ব্যার্থ হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়। এই হতাশার ফল দাঁড়ায় এই যে, নিয়মিত ও অনিয়মিত সকল যুদ্ধই বিপুল সংখ্যক নিরস্ত্র বেসামরিক ও দুর্বল মানুষের অপরিমিত ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। তাদের যথেচ্ছা রক্তপাত ঘটায় এবং তাদের মানবাধিকার পদদলিত করে। যুলুম ও আগ্রাসনের হাত যতই উদ্ধত ও যতই দীর্ঘ হোক না কেন, ন্যায়বিচার যে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তি সে কথা চিরদিনই সাঠিক থাকবে।

সারা পৃথিবীতে সংঘাত ও সংঘাতের যত দেশী ও বিদেশী পক্ষ রয়েছে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে সহিংসতা বর্জন ও মৌলিক মানবাধিকারে প্রতি সম্মান প্রদর্শনই তাদের পক্ষে কল্যাণকর ও তাদের স্বার্থের নিরাপত্তাদায়ক। আজকের এ বিশ্বপল্লীতে ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সহযোগিতা নিঃসন্দেহে সকল পক্ষের স্বার্থের রক্ষক এবং ভবিষ্যত প্রজন্মগুলোর জন্য অধিকতর কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

সংস্কার ও সংশোধনের আহ্বায়ক ও যুলুম নির্যাতনে জর্জরিত ইসলামী সংগঠনগুলোর উচিত যেন স্বদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আচরণ ও লেনদেনে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মপন্থা অবলম্বন করে এবং কোন হিংসাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ না করে। এমনকি এ সকল রাজনৈতিক দলের কৃত অন্যায় ও জুলুমবাজীর জবাবেও শান্তিপূর্ণ আচরণ করা উচিত। এটাই আপোষ ও সদাশয়তার পথ এবং যৌক্তিক চিন্তা গবেষণার আলোকে এটাই প্রকৃত ইসলামের পথ। একমাত্র এই পথ ধরেই শেষ পর্যন্ত সংস্কার সংশোধন ও আপোষের নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব। যুলুম নির্যাতনের অবসান ঘটানো সম্ভব এবং ইসলামী সমাজের ঐক্য, নিরাপত্তা, ইনসাফ, উন্নতি, প্রগতি, স্থিতি, ও পরার্মশভিত্তিক ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব।

পক্ষান্তরে যারা সংঘাত সংঘর্ষ, আগ্রাসন, জাতিতে জাতিতে ও সভ্যতায় সভ্যতায় ভ্রাতৃঘাতী সহিংসতার প্ররোচনা দেয়, তাদের সুমতি ফিরে আসা প্রয়োজন এবং ধ্বংস ও বিদ্রোহের পথ থেকে ফিরে আসা উচিত। কেননা বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ ও সংঘাত সংঘর্ষের ক্ষতিপূরণ দেয়া এবং বড় বড় বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের মূল্য দেয়া সমগ্র মানবজাতির পক্ষে সম্ভব নয়। সময় থাকতে বুদ্ধিমান ও শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিবর্গের উচিত এইসব ধ্বংস ও বিপর্যয়ের আহ্বানের মোকাবিলা করা ও এইসব হুমকি দূর করার জন্য মানব জাতির কাছে উদাত্ত আহ্বান জানানো, যা সমগ্র মানব জাতির ও মানবসভ্যতার ভবিষ্যতকে বিপন্ন করে তুলেছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

সারসংক্ষেপ

বস্তুত কোরআনের পথনির্দেশ ও রসূলের আদর্শ হচ্ছে, সমাজের সমস্ত দল উপদলের মধ্যে মতবিরোধ ও বিবাদ বিম্বাদের যে কোন পরিস্থিতিতে, যে কোন পর্যায়ে ও যে কোন আকৃতি প্রকৃতিতে সহিংসতা পরিহার করা। মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই এবং শান্তিপূর্ণ উপায়েই হওয়া সম্ভব– অন্য কোন উপায়ে নয়। মুসলিম উম্মার সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা জনগণের মাঝে পরামর্শের মাধ্যমেই পরিচালিত হওয়া চাই। তবে কোন দল যদি আগ্রাসী পন্থায় অন্য দলের ওপর সহিংস আক্রমণ চালায়, তবে তার প্রতিরোধের উদ্যোগও জনতা ও পরামর্শদাতা নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকেই এবং শান্তিপূর্ণ ও আপোষমূলক শোভনীয় উপায়েই আসবে। এটাই সর্বোত্তম উপায়। নচেত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা ও পরামর্শকদের পক্ষে আগ্রাসী হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনকারীর পক্ষের ওপর বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে তার বিপথগামীতা থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করা সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সংগত। সমকালীন বিশ্বে শাসকের স্বৈরাচার প্রতিরোধের সবচেয়ে সফল উদাহরণ হলো, ইরানের বেসামরিক জনতার অভ্যুত্থান, যা জনতার শান্তিপূর্ণ অথবা আপোষহীন সংগ্রামের জোরে রাজকীয় সশস্ত্র বাহিনীর ইচ্ছাকে ব্যর্থ ও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। আর সবচেয়ে নিষ্ফল ও ব্যর্থ অভ্যুত্থান ছিল সম্ভবত আলজেরিয়ার কতিপয় বিরোধী দলের সহিংস প্রতিরোধ।

এই সহিংস প্রতিরোধ তাদেরকে সেনাবাহিনীর সাথে এক রক্তাক্ত প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিয়েছে, মুসিলিম উম্মাহ থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ও তাদের ইচ্ছা শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। ফলে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে এবং সমাজের ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামষ্টিক ইচ্ছা দমনে তা কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

অবশ্য যখন কোন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপাত্যবাদী শক্তির পক্ষ থেকে যুলুম ও আগ্রাসন চলে, তখন আক্রান্ত জাতিগুলোর সামনে প্রতিভাত হয় বহু

www.pathagar.com

সাজসরঞ্জাম ও জাতীয় যুদ্ধফ্রন্ট। এমতাবস্থায় সেই মূলনীতি যথারীতি বহাল থাকে। মূলনীতিটি হলোঃ সমাজের বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরকে শোধরানোর লক্ষ্যে সহিংসতার প্রয়োগ অবৈধ। কেননা তা সমাজকে দুর্বল করে ও অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নাক গলানোর পথ খুলে দেয়। তাই এরূপ ক্ষেত্রে আধিপত্যবাদী বিদেশী অত্যাচারী শক্তি ও তার স্বার্থকে সরাসরি লক্ষ্য বানানো উচিত, যাতে তাকে এতটা প্রতিশোধ দেয়া যায় যেন সে তার যুলুম শোষণ ও আগ্রাসনের অর্জিত সুফলের পুর্ণমূল্যায়ন করতে বাধ্য হয় এবং নিপীড়িত মোজাহেদদের প্রতি জনগণ ও মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে জরুরী সাহায্য, ও সহানুভুতির পর্যাপ্ত সরবরাহ আসে। এই মূলনীতির প্রতি আনুগত্য যত বাড়বে, ক্ষয়ক্ষতি ততই কমবে। জনগণের একাত্মতা ততই বদ্ধি পাবে এবং প্রতিরোধ বা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও নিরাপত্তা জোরদার হবে। এমনকি শাসক মহল চাপের সম্মুখীন হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ জোরদার হবে। এ ক্ষেত্রে অন্যতম সফল উদাহরণ হলো ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আলজেরীয় প্রতিরোধ আন্দোলন, ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আফগান প্রতিরোধ আন্দোলন।

সাম্প্রতিককালে এর আরেকটা সফল উদাহরণ হচ্ছে ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ আন্দোলনের ঘোষিত বিশিষ্ট পদ্ধতি যা ইহুদী আগ্রাসন ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং একমাত্র তাকেই লক্ষ্য করে পরিচালিত হচ্ছে। এই পদ্ধতি অনুসরণের কারণে ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ আন্দোলন জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত সমর্থন ও সহানুভুতি পাচ্ছে॥ যদিও আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিরোধ খুবই জটিল ও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন। উচ্চতর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, প্রতিরোধ আন্দোলনের এই কর্মপদ্ধতি ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষকে ইহুদী শত্রু রাষ্ট্রের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কাজেও পরোক্ষ সমর্থন যুগিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ফিলিস্তিনী জনগণের অধিকারের যতটুকু আদায় করা সম্ভব, ততটুকু আদায় করার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।

তবে স্বাধীন দেশ সমূহের পারস্পরিক সংঘাত ও বিরোধের ব্যাপরে কোরআনের নির্দেশ ও রসূল (স) এর আদর্শ হলো, সেই সব দেশের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকদের সাথে ও শাসক মহলের সাথে প্রত্যক্ষ দেন দরবার চালানো। সাধারণ জনগণ ও অক্ষম দুর্বল সমাজের সাথে দেন দরবার চালানোর কোন প্রয়োজন নেই। এই দেনদরবার হয় ন্যায্য অধিকার ও সুবিচার পাওয়ার উদ্দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ আলোচনার আকারে অনুষ্ঠিত হবে। এতে মুসলমানদের

www.pathagar.com

যে অধিকার প্রাপ্য হবে তাদের জন্যও সেই অধিকার প্রাপ্য হবে, আর মুসলমানদের ওপর যে দায়দায়িত্ব অর্পিত হবে, তাদের ওপরও সেই দায়দায়িত্ব অর্পিত হবে। আর এটা তাদের ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে ও চুক্তির মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যথায় সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ দ্বারা শক্তি প্রয়োগ করা অপরিহার্য হবে, এবং এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রম করা চলবে না। কেননা সাধারণ প্রজারা শাসকদের জোর যুলুমের পক্ষ অবলম্বন ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতাই রাখে না। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে দেনদরবার চালানোর যে অভিজ্ঞতা রসূল (সা) নিজের জীবদ্দশায় অর্জন করেছিলেন। তা দ্বারাও একথাই প্রমাণিত হয়েছে। আর বিংশ শতাব্দীর বড় বড় আগ্রাসী শক্তির সাথে সংগঠিত বৃহত্তম সংঘর্ষগুলোর মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে।

পক্ষান্তরে হিজরত আইনসিদ্ধ হয় তখনই, যখন যুলুম কঠিন ও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজারা মজলুমকে রক্ষা করতে ও তাকে সাহায্য করতে অক্ষম হয়ে যায়। এ সময় হিজরতের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে হয় ধ্বংসের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা, অথবা যুলুমবাজ শাসক গোষ্ঠীকে প্রতিহত করতে পারে এমন দল গঠন করা ও তার নেতৃত্ব দেয়া। জাতির সংখ্যাগুরু জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা তাদের ওপর থেকে যুলুম নিপীড়নের অবসান ঘটানো, জনগণের সকল অংশের সমঅধিকার আদায় করা, মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সাকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। সকলের অধিকার ও কর্তব্য সমান সমান করা এবং সকলের ধর্ম, আকীদা বিশ্বাস ও জীবিকা উপার্জনের অধিকার সংরক্ষণ করা, আর সকল অবস্থায় মুসলমানদের হিজরত স্থল থেকে সত্যের দাওয়াত ও সমাজ সংস্কারের কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং সকল মানুষের কল্যাণ সাধন ও হেদায়েতের চেষ্টা সাধ্যমত অব্যাহত রাখতে হবে।

ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক পর্যায়ে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার দ্বারা এমন ইতিবাচক চেষ্টাকে বুঝানো হয়, যা মানুষকে সৎকাজের প্রেরণা যোগায়, এমন উপদেশকে বুঝানো হয়, যার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলা হয় এবং গোপনে ও প্রকশ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাধ্যমত এমন কাজ করাকে বুঝানো হয় যাতে উদাসীন ব্যক্তি উদ্দীপিত হয়, অভাবী ব্যক্তি সাহায্য পায় এবং প্রকাশ্যে গুনাহর কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য জেদ ধরে ও যুলুম ও অরাজকতা ছড়ায়॥এমন লোককে আইনসংগত পন্থায় প্রতিহত করা হয়। সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা দ্বারা এ কথা বুঝানো হয় না যে, কোন ব্যক্তি বা দল সদুদ্দেশে বা অসদুদ্দেশে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কোন কিছু কার্যকর করবে

www.pathagar.com

এবং এভাবে সমাজে বিতর্ক, বিভেদ ও গোলযোগের সৃষ্টি করবে ও শাসকদের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হবে।

সভ্যতায় সভ্যতায় ও ধর্মে ধর্মে সম্পর্ক ও সংযোগ প্রতিষ্ঠা অবশ্যই বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সাথে আলাপ আলোচনা ও সদাচরণের মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়ের অন্বেষায় এবং ইহলোক ও পারলৌকিক পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হবে। আর ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মাঝে সংলাপ অবশ্যই ইতিবাচক, সমঝোতাপূর্ণ, সর্বাত্মক, ও উভয় পক্ষের মতামতের পরিপূরক ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া চাই। কেননা উভয়ের কাছেই এমন কিছুনা কিছু রয়েছে, যা অপর পক্ষের জন্য উপকারী। উভয় পক্ষের উচিত এমন একটা একক পথ ও পন্থা উদ্ভাবন ও আয়ত্বাধীন করতে অপর পক্ষকে সাহায্য করা, যা একটা কল্যাণকর বিশ্বজোড়া মানবিক সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য জরুরী এবং যা একাধারে ইহকালীন জীবন, ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করে, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার জীবনের সমৃদ্ধি এনে দেয়। পাশ্চাত্য তার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণমূলক উপকারণনাদি দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়ম বিধি জানা ও প্রাকৃতিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও পূর কৌশলের উন্নয়নের ক্ষমতা অর্জন করেছে। পক্ষান্তরে ইসলামের কাছে রয়েছে তাওহিদী চিন্তা চেতনা। রয়েছে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোদের জ্ঞান এবং মানব সমাজের সুস্থতা ও বিশুদ্ধতার রীতিনীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্য। আর এই উভয় উপাদানের সূক্ষ্ম শেকড় মানব সত্তার অভ্যন্তরে বদ্ধমূল রয়েছে। এই দুটো উপাদানের একটা অপরটাকে কখনো ধ্বংস করতে পারবেনা। ধ্বংসাত্মক ও বলপ্রয়োগ মুলক সংঘাত ও সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য এবং আজ পর্যন্ত এরূপই হয়ে আসছে। তাই জ্ঞানীজনদের উচিত অবিলম্বে অংশীদারসুলভ সংলাপ শুরু করা, গঠনমূলক ও সংস্কারধর্মী ইতিবাচক সমন্বয় প্রক্রিয়ার সূচনা করা। বস্তু ও আত্মা উভয়ের দাবির সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ নেয়া, উৎপাদন ও ইনসাফপূর্ণ বন্টন, উপার্জন ও উপার্জিত সম্পদের পবিত্রতা সাধন আর সংস্কার ও স্বাধীনতা, দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সংযুক্তি সাধন।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সমস্যা

এই আলোচনার সমাপ্তি ঘটার আগে এ আলোচনার পরিকল্পনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তাত্ত্বিক সমস্যার ব্যাপারে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। কেননা তত্ত্বের স্বাধীনতা, বিশুদ্ধতা ও সচ্ছতার অভাব চিন্তার নৈরাজ্য ও খন্ডিত বিচার-বিচেনাকে অনিবার্য করে তোলে। আর এই চিন্তার নৈরাজ্য ও খন্ডিত বিচার-বিবেচনার ফলে সমস্ত অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা খোঁড়া যুক্তি ও একপেশে দাবির স্বপক্ষে চলে যায়। প্রত্যেক গবেষক তার নিজ দৃষ্টিভংগির সমর্থিত যুক্তি প্রমাণ পেয়ে যায় এবং সকল চিন্তাগবেষণা ও আলাপ আলোচনার শেষ ফল দাঁড়ায় মত ও পথের অসচ্ছতা ও বিভিন্নতা। আর এই অসচ্ছতা ও বিভিন্নতার দরুন কোন মতৈক্যে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমি কোরআন ও হাদীসের সেই সকল স্পষ্টোক্তি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি, যেগুলো সম্পর্কে আমি মনে করি যে, এই আলোচনার বিষয়বস্তুকে যারা গুরুত্ব দেন, তারা ওগুলোর ওপর নির্ভর করেন ও আস্থা রাখেন, এবং ওগুলোর পর্যালোচনা করা জরুরী মনে করেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই সমস্যাটাকে আমার বুঝার অনুপাতে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেয়া। এ ব্যাপারে আমি কোরআন, সুন্নাহ এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য সংক্রান্ত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেছি। পাঠকের মনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যাতে অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট না থাকে, সেজন্যই আমি এরূপ চেষ্টা চালিয়েছি।

তবে এই আলোচনার তাত্ত্বিক ভিত্তিকে যত দূর সম্ভব, আলোচনার স্বাভাবিক ধারায় যতটা সাধ্যে কুলায় এবং বক্তব্য বিষয়ের ঐক্যতান, অখণ্ডতা ও পরিপূরকতার ভিত্তিতে কোরআন ও সহীহ হাদীসের ওপরই প্রতিষ্ঠিত করেছি। এদুটো হচ্ছে এ আলোচনার চূড়ান্ত ঐশী উৎস। অপর দিকে যৌক্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সমাজতান্ত্রিক ও প্রাকৃতিক সত্যের ওপরও এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং এগুলো এ আলোচনার দৃশ্যমান মানবীয় উৎস। মানব জগতের জীবনগ্রাহ্য এবং নির্দিষ্ট স্থান ও

www.pathagar.com

কাল সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীকে যথাযতভাবে অনুধাবন করার জন্য এই সব মানবীয় উৎস ফলদায়ক হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ওহির উদ্দেশ্য এবং তার ইহকালীন ও পরকালীন চিন্তার শিক্ষাগুলো বুঝবার ব্যাপারেও তা সহায়ক।

ওহির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও আমার এ আলোচনারমূল তত্ত্বটি পবিত্র কোরআনের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল। কেননা কোরআনই হচ্ছে সর্বোচ্চ সনদ, অকাট্য প্রমাণ, এবং হাদীস সহ অন্য সকল সনদের ওপর কর্তৃত্বশীল। কোরআন হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের মাপকাঠিও এবং তার সর্বোত্তম বিশ্লেষকও। অনুরূপভাবে, রসূল (সঃ) এর অনুসৃত সাধারণ নীতিমালা ও রসূলের (সঃ) বাস্তব দৃষ্টান্তসমূহ ও যুদ্ধে ও সন্ধিতে, ন্যায়বিচার, সামাজিক নিরাপত্তা, সহানুভুতি ও পরামর্শ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অকাট্য বিধান স্বরূপ। এ জিনিসগুলো প্রকৃতপক্ষে রসূল (সঃ) এর আদর্শের মূলনীতি সমূহের লক্ষ্য উপলব্ধিতে সহায়ক মৌলিক উপাদন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তা রসূলে আদর্শের খুঁটিনাটি ধারাগুলোর উপলব্ধিতেও সহায়ক। পরামর্শ ব্যবস্থাটা আসলে রিসালাত ও গোটা ইসলামের দৃশ্যমান ও কার্যকর বাস্তবায়নের নিয়ামক। এ দ্বারা রসূলের অনুসৃত নীতিমালা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ও রীতিনীতিকে কোরআনের আওতাধীন মৌলিক বিধানের রূপ দেয়া হয়। হাদীসের শাব্দিক বর্ণনার পরিবর্তে তার মর্মগত বর্ণনার কারণে এবং উদাসীনতা, অনুমান, আলসেমি ও হেয়ালিপনার কারণে পাঠক ও গবেষকরা হাদিসের প্রকৃত ও বিশুদ্ধ বক্তব্য থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে পারেন। হাদীসের এরূপ আনুমানিক বর্ণনা থেকে নানা ধরনের ভিত্তিহীন, ও অলীক চিন্তাধারা ও অনুরূপ অলীক চিন্তধারা প্রভূত কার্যকলাপের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। জ্ঞানগত প্রেরণা ও সৃজনশীতা দুর্বল হয়ে যায় সাধারণ মানুষের কৃষ্টি সংস্কৃতিতে জড়তা ও স্থবিরতা ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের উচ্চতর মূল্যবোধগুলো বিকৃত হতে থাকে এবং তার তাওহীদ ও খেলাফত তত্ত্ব থেকে উদ্ভুত উচ্চ ধ্যান-ধারণাগুলো ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। সার্বিক ও সুসংবদ্ধ আদর্শিকতা বর্তমান আলোচনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ওহির উৎস, দৃশ্যমান ইহকালীন জগতের তথ্যের উৎস বুদ্ধিমত্তা, প্রকৃতি ও ঘটনাবলীর উৎস, বৈজ্ঞানিক চিন্তাগবেষণা ও নিরীক্ষণ জনিত তত্ব ও তথ্য, এবং সমকালীন মানবীয় তত্ত্বজ্ঞানের আলোকেই এই সার্বিক ও সুসংবদ্ধ আদর্শিকতা এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে। অথবা অতীতের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও অতিন্দ্রীয় চিন্তাগবেষণার কারণে আমাদের পূর্বতন চিন্তাবিদদের অনেকেই বহু ক্ষেত্রে আদর্শের ব্যাপকতা হারিয়ে বসতো। এই তাত্ত্বিক ও আদর্শিক সর্বব্যাপিতার উদ্দেশ্য হলো গবেষণাধীন বিষয়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ দক্ষতা অর্জন, যাতে তাকে সর্বব্যাপী মূলনীতির আকারে প্রণয়ন করা যায়, ধর্মীয় ও মানবীয় দিক দিয়ে তার ব্যাখ্যা দেয়া

www.pathagar.com

যায়, এবং আংশিক তাত্ত্বিকতা ও আংশিক বিচার বিবেচনা থেকে নিবৃত্ত থাকা যায়। অবশ্য সমাজ যখন সর্ববৃহৎ আকারে থাকে এবং তার সম্পর্ক সংযোগ, সম্ভাব্যতা ও পরিচিতি যথারীতি বহাল ও অপরিবর্তিত থাকে, তখন তার অবস্থা স্বতন্ত্র। কিন্তু যুগ, প্রেক্ষাপটে, সমাজের শক্তি সম্ভাবনা ও সম্পর্ক-সংযোগ যখন পাল্টে যায়, তখন আংশিক ও অসম্পূর্ণ বিচার বিবেচনা কেবল বিভ্রান্তি ও বিপদগামিতার দিকেই টেনে নিয়ে যায়।

উল্লিখিত তাত্ত্বিক দিকনির্দেশনার আলোকে এ আলোচনা থেকে যে দৃষ্টিভংগী অর্জিত হয়, সেটাই সম্ভবত এমন সভ্যতা-ঘনিষ্ঠ মানবীয় ও ইসলামী দৃষ্টিভংগী তৈরী করে দেয়, যা ন্যায়বিচার, ভারসাম্য, শান্তিসম্প্রতি ও সংস্কার সমঝোতার প্রাণশক্তির সবচেয়ে কাছাকাছি।

সম্ভবত এ আলোচনায় অতীতে মুসলিম সমাজগুলোর ব্যর্থতার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে। সে দিকটি হলো, মুসলিম উম্মাহর সমগ্র ইতিহাস জুড়ে সমাজ সংস্কারে এবং সমাজ থেকে যুলুম, অবিচার ও স্বৈরাচারের উচ্ছেদে সহিংস কর্মকাণ্ড শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ এটা একটা প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলিম উম্মাহই ইতিহাসে সর্বপ্রথম ন্যায়বিচার শান্তি ও মানবীয় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমি এ ব্যাপারে আশাবাদী যে, আমার এ আলোচনা ও এর আলোকে পরিচালিত তাত্ত্বিক ও তথ্যগত চিন্তাগবেষণা ওহির প্রকৃত দিক নির্দেশনা নির্ণয়, পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়কে উম্মাহর সকল সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হিসেবে চিনতে ও বুঝতে সাহায্য করবে। এ দ্বারা মুসলিম সমাজের বহু বিকৃতি ও বিভ্রান্তি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ও তাদের নেতৃত্বের স্বৈরাচার অনেকাংশে লাঘব হবে। অথচ এই সব সমস্যা মুসলমানদের বহু সংস্কার কর্মসূচি ও তার নেতৃস্থানীয় দায়িত্ব পালনকে বিঘ্নিত করে আসছে।

এই আলোচনায় ও এর পূর্ববর্তী আলোচনা সমূহে যে কর্মপন্থা অনুসৃত হয়েছে, তার ফলে সম্ভবত আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, মুসলিম উম্মাহর অধোপতনের যুগলোকে, তার কাজের ব্যর্থতাকে, এবং উন্নয়ন ও কালগত ও স্থানগত পরিবর্তনকে ধারণ করার ব্যাপারে তার চিন্তার অক্ষমতাকে বুঝবার ব্যাপারেও এ আলোচনা সহায়ক হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এই সর্বব্যাপী বিশ্লেষণাত্মক ও সুসংবদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনা নিজেই তার সুদূর প্রসারী দিকগুলোকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। আর এর পাঠক যুব সমাজকে ইসলামী চিন্তাধারার

www.pathagar.com

ক্রমবিকাশে, তার সভ্যতা-সহায়ক সংস্কার কর্মসূচিতে তার কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষমতা পুনর্বহালে, প্রতিষ্ঠান সমূহ নির্মাণে, কার্যকর বাস্তবানুগ পরিকল্পনা প্রণয়নে, এই পরিকল্পনা দ্বারা উম্মাহর সন্তোষ অর্জনে এবং সমস্যা উতরে যাওয়ার দক্ষতা অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

আমার ধারণা, তাত্ত্বিক ও বিধিগত সংস্কারের নিশ্চয়তা বিধানে পয়লা পদক্ষেপ হলো ইসলামী শিক্ষা কর্মসূচি পুনপ্রণয়নে এ বইখানাকে কাজে লাগানো এবং মুসিলম বুদ্ধিজীবীদেরকে যাদের ভেতরে ফেকাহবিদগণও অন্তভুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ বানানোর ব্যবস্থা নেয়া উচিত॥ যাতে এই প্রথম পদক্ষেপের মনস্তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়া ইসলামী জ্ঞানের উৎসগুলোকে ও তার আনুসাংগিক দিকগুলোকে নিজের ভেতর একীভূত করে নিতে পারে। ওহি, যুক্তি, স্বভাবপ্রকৃত ও বাস্তবতা এই চারটে হলো ইসলামী জ্ঞানের উৎস ও তার আনুসংগিক দিক সমূহ। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে অজ্ঞতা বা তার জ্ঞান ও বোধগম্যতা অর্জনে অক্ষমতার কারণে যেন ইসলামী জ্ঞানের উৎসগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে তাদেরকে দিশেহারা করে না দেয়।

আলেম সমাজের চিন্তাগত ও তাত্ত্বিক দক্ষতার পূর্ণতা ও পরিপক্কতা অর্জন অপরিহার্য, তাই তাদের বিশেষজ্ঞীয় দিকগুলো যতই বিচিত্র ও বিভিন্ন রকমের হোকনা কেন এবং তাদের ভেতরে ধর্মীয় বক্তা ও প্রচারক, আইনবিদ ফকীহ ইত্যাকার যত রকমের বিশেষজ্ঞই থাকুক না কেন। সুতরাং জ্ঞান, বিশেষত ধর্মীয় বিদ্যার শিক্ষার্থীদের জ্ঞান কেবল ঐতিহাসিক জ্ঞানের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না । কেননা এ ধরনের একপেশে ঐতিহাসিক সংস্কৃত থেকে ইতিহাস সংক্রান্ত বির্তক ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। এর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ও প্রচার দ্বারা জনগণের কোন কল্যাণ বা বড় কোন উপকার সাধিত হবে না। এর মূলে কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্দী হয়ে থাকতে পারে, কিংবা ওয়ায নছিহতের মাহফিলের বা লাইব্রেরীর শেলফের শোভা বর্ধন করতে পারে এমন কৃষ্টি ও তথ্যও অবশিষ্ট থাকবে না।

আমি এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সংশয় পোষণ করি না যে, এই ইস্পিত শিক্ষাসংস্কার॥ যার তরতাজা ফুলের কুঁড়িগুলোকে মালয়েশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে মাত্র এক দশকেই ফুটতে দেখেছি এবং বিপুল জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে এমনভাবে বিকশিত হতে দেখেছি যে, তারা সব রকমের চ্যালেঞ্জের মুখেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব, সামর্থ ও কার্যকারিতাকে প্রমাণ করেছে। সেখান থেকে এমন সব স্বার্থক ও সজীব ইসলামী ক্যাডার তৈরি হয়েছে, যারা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমগ্র মুসলিম উম্মাহর আশা আকাংখ্যার প্রতীক মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানী। মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম শিক্ষাবিদ, মুসলিম রাজনীতিবিদ, মুসলিম

www.pathagar.com

আইনবেত্তা এবং মুসলিম আকীদা ও আদর্শের প্রচার আহবায়ক ও পথ প্রদর্শক হয়ে গড়ে উঠেছে। আর কাঙ্খিত এই শিক্ষা সংস্কারে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিত্বকে তার শিক্ষাকাল থেকেই এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তার আকীদা বিশ্বাস, জ্ঞান ও কৃষ্টি অত্যন্ত নিখুঁত ও পরিচ্ছন্নভাবে তৈরি হয় আর মনস্তাত্বিক সত্তাকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়ে মার্জিত ও সংস্কৃতবান করতে হবে যে তখন যতই নেতিবাচক, সেচ্ছাচারী উচ্ছৃংখল হোক, সে গড়ে উঠবে একটা দলের সুসভ্য সদস্য হিসেবে, আল্লাহর একজন সৃজনশীল ইতিবাচক প্রতিনিধি হিসাবে, একজন স্বাধীনচেতা নেতা হিসাবে, হীনমান্যতা, নীচুতা, ভীতি ও কাপরুষতা থেকে মুক্ত ব্যক্তি হিসাবে, এবং গোলাম সুলভ মানসিকতা থেকে মুক্ত মর্যাদাবান ও আত্মসম্মানবোধ সম্মানী বান্দা হিসাবে। বস্তুত যারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে সত্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে বিনয়ী, নিরহংকারী ও আত্ম সম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে গড়ে তুলেছে এবং যারা নিজেদেরকে উশৃংখল অহংকারী ভীরু ও হীনমাণ্যরূপে গড়ে তুলেছে– এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রয়েছে। ভীরু, কাপুরুষ ও নেতিবাচক গোলাম স্বভাবের মানুষগুলোর হীন মানসিকতা মুসলিম উম্মাহর বহু সংখ্যক সদস্যের পতন যুগের স্বভাব ও প্রতীক হিসাবে বিদ্যমান এবং এই স্বভাবই উম্মাহর দুর্বলতা, বিপথগামিতা, ও সভ্যতার প্রতিযোগিতায় পশ্চাতগামিতার মূল কারণ। মুসলিম উম্মাহ আজও এই সব কদর্য স্বভাবের কুফল ভোগ করে চলেছে।

মুসলিম উম্মাহর আজকের প্রধান সংকট হলো তার জ্ঞানগত ও চিন্তাগত সংকট। তার জ্ঞানগ ও চিন্তগত পরিশুদ্ধি , তার অগ্রগতি ও সংস্কার কর্মসুচির সাফল্যের মূল শর্ত। এই সংস্কার কর্মসূচির সূচনা শিক্ষাগত সংস্কার দিয়েই করা উচিত এবং অন্যান্য সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে এটাকে বিলম্বিত করা, বা উপেক্ষা করা কিছুতেই উচিত হবে না। সেই সাথে মুসলিম জনগণের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো ও মানসিক গঠন পদ্ধতির বিশুদ্ধকরণের লক্ষ্যেও কাজ করা উচিত যাতে উম্মাহ তার কর্মক্ষমতাকে পুনর্বহাল করতে পারে, তার সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ইচ্ছাকে ফিরিয়ে আনতে পারে এবং শক্তিমান ও বিশ্বস্ত প্রজন্মের হাতে তার নিজের মিশন সফল করার ও সফল চ্যালেঞ্জ ও বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে।

মহান আল্লাহর কাছে আমি এজন্য প্রেরণা, পথনির্দেশনা, তাওফীক ও সুমতি প্রার্থনা করি। তিনি সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের নিয়ামক এবং তিনিই প্রার্থনার শ্রোতা ও মঞ্জুরকারী।

www.pathagar.com

এই সিরিজের অন্যান্য বই

- ❑ উন্নয়নের দর্শন ঃ ইসলামী দৃষ্টিভংগি (নং ৪)
  ইবরাহীম ওমর, প্রকাশ ২, ১৯৯২, ৬৪ পৃঃ, মূল্য ৫ ডলার
- ❑ বিজ্ঞান ও ঈমান ঃ ইসলামের তথ্যানুসন্ধান মতবাদের প্রবেশ দ্বার (নং ৫)
  ইবরাহীম আহমদ ওমর, প্রকাশ ১৯৯২ পৃঃ ৭, মূল্য ৫ ডলার
- ❑ মুসলমানদের মধ্যে চিন্তার ঐক্য সৃষ্টিতে মতামতের স্বাধীনতার ভূমিকা (নং ৬)
  আব্দুল মজিদ আশ্-শায়ার, ১৯৯২, পৃঃ ৮৮, মূল্য ৫ ডলার
- ❑ ইসলামী সভ্যতার প্রাণশক্তি (নং-২) মুহাম্মদ আল-ফাযিল বিন আশুর, প্রকাশ ২, ১৯৯৩ পৃঃ ৮৭, মূল্য ৪ ডলার
- ❑ চিন্তা ও ধ্যান যৌথ পর্যবেক্ষণ থেকে একান্ত পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত ঃ ইসলামী মনস্তাত্বিক অনুশীলন (নং ৩), মালেক বদরী, প্রকাশ ১৯৯৩, পৃঃ ১১৯, মূল্য ৫ ডলার
- ❑ ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি ঃ গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের পন্থা (নং ১)
  ত্বাহা জাবির আল-আলওয়ানী, প্রকাশ ২, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৪, মূল্য ৫ ডলার
- ❑ হাকেমিয়াতুল কুরআন ঃ কোরআনের শাসন, (নং ৮)
  ত্বাহা জাবির আল-আলওয়ানী, প্রকাশ ১৯৯৬, পৃঃ- ৪০, মূল্য ৪ ডলার
- ❑ ফেকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি ও ইসলামী দর্শনের সাথে তার সম্পর্ক (নং ৯)
  আলী চুময়া মুহাম্মদ, প্রকাশ ১৯৯৬, পৃঃ ৪২, মূল্য ৪ ডলার
- ❑ "আল্লাহ আদমকে সকল নাম শেখালেন (নং ১০) মাহমুদ আদ্-দামারাদাশ, প্রকাশ ১৯৯৬, পৃঃ ৬৩, মূল্য ৫ ডলার
- ❑ একাধিকতা তত্ত্ব, মূলনীতি ও পুনর্বিবেচনা (নং ১১) ত্বাহা জাবির আল-আলওয়ানী, প্রকাশ ১৯৯৬, পৃঃ ৩০, মূল্য ৪ ডলার
- ❑ চিন্তাগত সংকট ও পরিবর্তনের পদ্ধতি সমূহ ঃ দিক দিগন্ত ও তার অন্বেষণ (নং ১২) ত্বাহা জাবির আল-আলওয়ানী, প্রকাশ ১৯৯৬, পৃঃ ৪০, মূল্য ৪ ডলার
- ❑ যুক্তিবিদ্যা ও কোরআনী মানদন্ড সমূহ ঃ আল-গাজ্জালীর পুস্তক আল ফিসতামুল মুসতাকীনের অধ্যয়ন (নং ৩) মুহাম্মাদ মিহরান, প্রকাশ ১৯৯৬, পৃঃ ৬২, মূল্য ৫ ডলার
- ❑ ইসলামী ঐতিহ্যে মানবীয় ব্যক্তিত্ব (নং ১৫) নাযার আল-আনী, প্রকাশ ১৯৯৮, পৃঃ ২৫৪, ৯.৫ × ৬.৫ ইঞ্চি, মূল্য ৭ ডলার
- ❑ আরব সমাজে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষার ভূমিকা ঃ ব্যর্থতার কারণ ও সাফল্যের উপাদানসমূহ (নং ৭), ত্বাহা জাবির আল-আলওয়ানী যন্ত্রস্থ।

www.pathagar.com

বি আই আই টি প্রকাশনা

1. *A Young Muslim's Guide to Religions in the World* (1992) by Dr. Syed Sajjad Husain
2. *Islam in Bengali Verse* (1992) by Poet Farrukh Ahmed Translated into English by Dr. Syed Sajjad Husain
3. *Directory of Specialists* (1993) edited by M. Zohurul Islam and Dr. A.K.M. Ashanullah
4. *Civilizaton and Society* (1994) by Dr. Syed Sajjad Husain
5. *Social Laws of Islam* (1995) by Shah Abdul Hannan
6. *ইসলামী উসুলে ফিকাহ* (১৯৯৬), মূল ঃ ডঃ তাহা জাবির আল-আলওয়ানী অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার
7. *Leadership : Western and Islamic* (1996) by Dr. Mohammad Anisuzzaman and Md. Zainul Abedin Majumder
8. *Guidelines to Islamic Economics : Nature, Concepts and Principles* (1996) by M. Raihan Sharif
9. *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী* (১৯৯৬) , মূল ঃ বি. আইশা লিমু এবং ফাতিমা হীরেন অনুবাদ ঃ ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান
10. *মুসলিম নারী পুরুষের পোশাক* (১৯৯৭), সম্পাদনা ঃ ডঃ জামাল আল বাদাবি অনুবাদ ঃ মোঃ শামীম আহসান
11. *Islamization of Academic Disciplines* (seminar proceedings) (1997) edited by M. Zohurul Islam.
12. *কোরআন ও সুন্নাহ ঃ স্থান কাল প্রেক্ষিত* (১৯৯৭), মূল ঃ ডঃ তাহা জাবির আল আলওয়ানী এবং ডঃ ইমাদ আল দীন খলিল, অনুবাদ ঃ শেখ এনামুল হক
13. *Origin and Development of Experimental Science* (1997) by Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan
14. *রাসুলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ* (১৯৯৮), মূল ঃ আকরাম জিয়া আল উমারী, অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম
15. *ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ* (১৯৯৮), মূল ঃ মারওয়ান ইব্রাহীম আল-কাইজী অনুবাদ ঃ শেখএনামুল হক
16. *Man and Universe* (1998) by Major Md. Zakaria Kamal

www.pathagar.com

17. *আত-তাওহীদ ঃ জীবন ও কর্মে এর তাৎপর্য* (১৯৯৮), মূল ঃ ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, অনুবাদ ঃ অধ্যাপক শাহেদ আলী
18. *Al-Zakah : A Hand Book of Zakah Administration* (1999) by M. Zohurul Islam
19. *The Islamic Theory of Jihad and The International System* (1999) by Md. Moniruzzaman
20. *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ* (২০০০), মূল ঃ ডঃ এম, উমর চাপরা অনুবাদ ঃ ডঃ মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব।
21. *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন* (২০০০), মূল ঃ ডঃ এম, উমর চাপরা অনুবাদ ঃ ডঃ মাহমুদ আহমদ
22. *Accounting : Philosophy, Ethics and Principles - An Islamic Perspective* (2000) by M. Zohurul Islam
23. *ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ* (২০০১) মূল ঃ ডঃ আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান, অনুবাদ ঃ আকরাম ফারুক

প্রকাশের অপেক্ষায়

1. *Human Rights : Different Dimensions (seminar proceedings)*
2. *Interpretion of Islam in Bengali (a synoptic English presentation of some Islamic works into Bengali)* by Dr. Syed Sajjad Husain
3. *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid* by Dr. Md. Athar Ali
4. *Miracle of Life* by Dr. Yousuf M. Islam
5. *Contemporary History of Bengal* by K. M. Mohsin
6. *আমাদের সংস্কৃতি ঃ বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ (সেমিনার প্রসিডিংস)*
7. *ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, মূল ঃ ডাঃ আবদুলহালিম আবুসুলায়মান অনুবাদ ঃ অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার।
8. *Public Policy Making* by Dr. Mumtaz Ahmad

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

ডঃ আব্দুলহামিদ আহমাদ আবুসুলায়মান
প্রেসিডেন্ট
ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

খৃষ্টীয় ১৯৩৬ মোতাবেক ১৩৫৫ হিজরীতে পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

পবিত্র মক্কাতেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে "মাদ্রাসাতু তাহমীরিল বিছাত" থেকে উত্তীর্ণ হন।

১৯৬৩ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম, এ পাশ করেন।

১৯৭৩ সালে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

প্রথমে রিয়াদস্থ বাদশাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা বিষয়ক সর্বোচ্চ পরিষদের সচিব হিসাবে, অতপর প্রশাসন তত্ত্ব সংক্রান্ত ফ্যাকাল্টির (সাবেক বাণিজ্য ফ্যাকাল্টির) ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বিশ্ব মুসলিম ছাত্র সংঘ ও ইসলামী ছাত্র সংগঠনসমূহের ফেডারেশন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানীদের ফোরাম, সৌদি আরবে বিশ্ব মুসলিম যুব সংস্থা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট এবং *American Journal of Islamic Social Sciences* এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ।

মুসলিম উম্মাহ্‌র গঠনমূলক ইসলামী সংস্থার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত বহু তত্ত্বীয় পুস্তক ও নিবন্ধ তিনি রচনা করেছেন।

বহু সংখ্যক আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

www.pathagar.com

পুস্তক পরিচিতি

আকারে ক্ষুদ্র, দৃষ্টিভংগিতে গভীর, ও বিষয়বস্তুতে গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকখানা সেই সব সৌখিন দ্রব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা ওজনে হালকা কিন্তু যার দাম অনেক। এতে এমন একটা বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা মুসলিম উম্মাহর সামনে প্রতিভাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর অন্যতম। মুসলিম উম্মাহ আজও এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিষয়টি হচ্ছে "সহিংসতা।" উম্মাহর ইতিহাসে এটা পরিবর্তন ও সংস্কারের হাতিয়ার হিসাবে প্রচলিত হয়ে গেছে। আর এর ফলে বর্তমানকাল পর্যন্ত নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা হয়ে উঠেছে হুমকির সম্মুখীন।

এই পুস্তক পাঠকের সামনে কোরআনের বক্তব্যের সুদূরপ্রসারী মর্মার্থ এবং রাসূল (সাঃ) এর অনুসৃত রাজনৈতিক নীতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরে। সমগ্র রিসালাত যুগ ব্যাপী তিনি পরিবর্তন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গৃহীত ইসলামের পরিকল্পনায় এই নীতিমালাকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থায় এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ যথাঃ আপন, পর, শত্রু ও মিত্র সকলের সাথেই তিনি এই নীতিমালা প্রয়োগ করেছেন।

উল্লিখিত কুরআনী বক্তব্য, রাসূলের (সাঃ) এই নীতিমালা ও তার অনুসরণের মাঝে এবং রিসালাত যুগের ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের মাঝে সম্পর্ক কি, তাও এই পুস্তকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এই বক্তব্য ও নীতিমালাকে বুঝাবার ব্যাপারে উম্মাহর কোন কোন চিন্তাবিদ যে ভুলভ্রান্তি করেছেন তাও চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ভুলভ্রান্তিগুলো মুসলমানদের গড়া সংস্কার আন্দোলন তাদের অধিকাংশ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এবং খেলাফত ভিত্তিক সমাজের ঈমান, ইনসাফ, সামাজিক নিরাপত্তা, পরামর্শ ব্যবস্থা ও গঠনমূলক কর্মকান্ডের উন্নতমানের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। উম্মাহর চিন্তাবিদগণ ও সংস্কারকগণকে কিভাবে হতাশা ও দুর্বলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে, কিভাবে এর ফলে উম্মাহর ইতিহাস আরো বেশী বিপর্যয় ও একনায়কত্বের দোষে কলংকিত হয়েছে এবং কিভাবে সংস্কার আন্দোলনগুলো নিছক "বিস্ফোরণে" রূপান্তরিত হয়েছে যা বলপ্রয়োগের চাপ, যুলুমের নিষ্পেষণ ও বিকৃতির নোংরামী থেকে জন্মলাভ করে।

পাঠক এই পুস্তকে ইসলামের এমন কতকগুলো নীতির ব্যাখ্যাও করেন, যা সহিংসতা রোধের জন্য জরুরী এবং যা অনুসরণ করলে শান্তি, সমৃদ্ধি ও পরামর্শ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ গড়ে উঠে। আধুনিক ইসলামী সংস্কার আন্দোলনকে কিভাবে সাফল্যের স্বর্ণতোরণে পৌছানো সম্ভব, সে ব্যাপারেও এ পুস্তক মুসলিম বুদ্ধিজীবীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ নতুন পরামর্শ ও সংলাপের প্রস্তাব দেয়।

www.pathagar.com